১৯৮২-১৯৯০ সময়কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা: বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়ণের চ্যালেঞ্জ

এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ
২০১২

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ডঃ গিয়াস উদ্দিন মোল্যা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

গবেষক
শামীমা আকতার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৯ মার্চ ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**১৯৮২-১৯৯০** সময়কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাঃ বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়ণের চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রীর বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করি নাই।

স্বাক্ষর

....

শামীমা আকতার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
এম.ফিল. গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শামীমা আকতার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত "**১৯৮২-১৯৯০** সময়কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা: বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়ণের চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়েছে। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার জানামতে অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই।

স্বাক্ষর

....
তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ডঃ গিয়াস উদ্দিন মোল্যা
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা, বাংলাদেশ।

ABSTRACT

বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশের জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের মার্চে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন এবং ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত তা ধরে রাখেন। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্বে অন্যায়ভাবে সামরিকবাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকৃত দেশসমূহে গণতন্ত্রায়নের একটি বড় তরঙ্গ দেখা দেয়। অন্যান্য অনেক সামরিক শাসকদের মতো এরশাদ ও গণবিপ্লবের মুখে ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। তার শাসনামলে দেশের সর্বস্তরে সামরিকীকরণের ফলে আমলাতন্ত্র এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সুবিধাভোগী আমলা ও রাজনৈতিক অভিজাতদের মাঝে আন্তঃগ্রুপ দ্বন্দের প্রাদুর্ভাব ঘটে যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সমাজ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক সমতা এবং সুবিচারের মতো স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিচ্যুত হয়ে পড়ে। জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসন তাই বাংলাদেশের জনগণের ওপর রাষ্ট্রের আগ্রাসন হিসেবে গণ্য করা হয়। একটা দেশে সামরিক বাহিনী অপরিহার্য কিন্তু রাজনৈতিক ভূমিকার চেয়ে পেশাদারিত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি সামরিকবাহিনী গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই ১৯৮২-৯০ সালের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন মুলতঃ সামরিক একনায়কতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়াস। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব এবং সমাজের সর্বস্তরের নিরবিচ্ছিন্ন তৎপরতা, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, দাঙ্গা, বিদ্রোহ, সহিংসতা তথা সার্বিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশ থেকে সামরিকীকরনের এ আবর্জনা দূর হয়। মূলধারার বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের জোট, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির সাথে ছাত্র, শ্রমিক, সমাজের বুদ্ধিজীবী ও সর্বস্তরের পেশাজীবীরা এ আন্দোলনের আয়োজন করেন। এ আন্দোলনে সমাজের মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব এবং নিম্নবিত্তের সম্পৃক্ততা ও বিপুল অংশগ্রহণ এরশাদের পতন নিশ্চিত করেছে। সামরিক বাহিনী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন দমনমূলক পদক্ষেপের কারণে প্রচুর মানুষ কারাগারে বন্দী হয়। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী নিহত এবং অনেকে আহত হয়। এতে গণতান্ত্রিক বিরোধী দলে পাল্টা সহিংসতার জন্ম হয়। এই গবেষণা, গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পদ্ধতিতে তদন্ত করে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য সামাজিক কাঠামোতে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তার সামাজিক উৎস নিয়ে অনুসন্ধান করে। এই গবেষণা নিশ্চিত করে যে, জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারী অপশাসন দেশে দুর্নীতির বিস্তার, অর্থনীতির লুণ্ঠন, সাংবিধানিক শাসন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধন এবং দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ধ্বংসলীলার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতিবাচক পরিণতি এনেছে। সবশেষে, এই গবেষণা প্রমাণ করে জনগনের চেতনা ও শক্তি সর্বদা অপরাজেয় এবং বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসনের পতনে এবং গনতন্ত্রায়নে গণমানুষের এই জাগ্রত চেতনা এবং দুর্বার আন্দোলনই মুখ্য ভুমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার মা যিনি আমাকে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখিয়েছেন এবং আমার আত্মার সাথে সব সময় বিরাজ করেন এবং আমার বড় ভাইয়া যিনি আমার জীবনের পথপ্রদর্শক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণালব্ধ এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি তাদের, যারা আমাকে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। "১৯৮২-১৯৯০ সময়কালে বাংলাদেশের নৈতিক অবস্থাঃ বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ গিয়াসউদ্দিন মোল্যার নির্দেশনা ও সহযোগিতায় সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। একজন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন ও শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমাকে অকৃপণভাবে সময় দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকসহ আরো অনেকের প্রতি, যারা বিভিন্ন সময় থিসিস রচনার উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমার অভিসন্দর্ভের ড্রাফট পড়ে মন্তব্য প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষকের সঙ্গে বিভিন্ন অধ্যায়ের তথ্যাদি নিয়ে মত বিনিময় করেছি। তাদের কাছেও ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, ঢাকাপাবলিক লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এসব লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি এ গবেষণাকর্মে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছ থেকে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। নানাবিধ সমস্যা, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে আমাকে যারা উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভুমিকা ০১-০২

১.২ গবেষণার লক্ষ্য। ০৩-০৫

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব। ০৬

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি। ০৭

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা। ০৮

১.৬ গবেষণার ক্ষেত্র। ০৯

১.৭ সংক্ষিপ্তসারঃ অধ্যায় পরিক্রমা। ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ সূচনা ১১

২.২ উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল এবং বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ। ১২-১৭

২.৩ বাংলাদেশে সামরিকীকরণের পটভূমি ১৮-১৯

২.৪ উপসংহার ২০

পাদটীকা ২১

তৃত্বীয় অধ্যায়

৩.১ সূচনা ২২

৩.২ বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির কারণ ২৩-২৬

৩.৩ এরশাদ সরকারের ক্ষমতায় আসার পটভূমি ২৭

৩.৪ যেভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ২৮-৩৩

৩.৫ উপসংহার ৩৪

পাদটীকা ৩৫-৩৭

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ সূচনা ৩৮

৪.২ এরশাদের ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড ৩৯-৪১

৪.৩ জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রচেষ্টা ও বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া। ৪২-৪৯

৪.৪ এরশাদের সামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জ

৪.৫ উপসংহার ৫০-৬৪

পাদটীকা ৬৫

৬৬-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ সূচনা	৬৮-৬৯
৫.২ এরশাদের পতন ও এর কারন	৭০-৭১
৫.৩ এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭২
৫.৪ এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন	৭৩-৯৮
৫.৫ উপসংহার	৯৯
পাদটীকা	১০০-১০৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	
৬.১ সূচনা	১০৪-১০৫
৬.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন	১০৬-১০৮
৬.৩ নির্বাচন ১৯৯১ এবং গণতান্ত্রিক সুশাসনের পথে পদক্ষেপ	১০৯-১১১
৬.৪ উপসংহার	১১২-১১৩
পাদটীকা	১১৪
সপ্তম অধ্যায়	
৭.১ উপসংহার	১১৫-১১৬
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	১১৭-১২৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করেন। বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সীমাহীন দূর্নীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরশাদ নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং অপর দুই বাহিনীর প্রধানগণ উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর আহসান উদ্দিনকে সরিয়ে এরশাদ নিজেই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার দৃশ্যত এরশাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান। জেনারেল জিয়া নিহত হওয়ার (৩০ মে ১৯৮১) পর থেকেই তিনি এ লক্ষ্যে মনস্থির করেন বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে তিনি নিজের অবস্থান গুছিয়ে নিতে এবং ভবিষ্যতে একটি আরো অনুকূল অবস্থার অপেক্ষায় কিছুটা কালক্ষেপণ করেন মাত্র। এ সময়ে তিনি দেশ শাসনে সেনাবাহিনীর স্থায়ী ভূমিকা থাকার কথা সেনা সদস্যদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। আসলে এটাই ছিল সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের পূর্বাভাষ ও চূড়ান্ত ইঙ্গিত। ক্ষমতা গ্রহণের পর এরশাদ সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন, জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন, মন্ত্রীসভা বাতিল করেন, সংবিধান স্থগিত করেন, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন, জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালান এবং বেসামরিকীকরণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি কিছু কার্যক্রম করেন। যেমন- রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরুর অনুমতি, ১৮ দফা কর্মসূচি, স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন, গণভোট অনুষ্ঠান, উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠান, জাতীয় নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংবিধানের সংশোধনী ও করেন। কিন্তু ১৯৮২ সালে এরশাদের ক্ষমতা দখল থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এরশাদের ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত কোন কর্মকান্ডকেই বৈধতার সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এরশাদ প্রশাসন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিচার বিভাগ, সংবাদপত্র, সংস্কৃতি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আমলাতন্ত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামরিকীকরণ করেন যা গণতন্ত্রের জন্য হুমকী স্বরূপ। এরশাদ তার দীর্ঘ প্রায় ৯ বছরের শাসনামলের পুরো সময় প্রবল গণআন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ আন্দোলনে রাজনৈতিকদলের পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, সাংবাদিক, বেতার টেলিভিশন শিল্পী, সংস্কৃতিসেবি, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক-কর্মচারী প্রভৃতি শ্রেণী ও পেশার জনগণ শামিল হয়। গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এরশাদ বিরোধী বিভিন্ন জোট এবং শ্রেণী ও পেশাজীবীদের মধ্যে আন্দোলনের নতুন নতুন সংস্থা। ১৯৯০ সালে নভেম্বর মাস থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা পায় এবং দ্রুত তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। এর মূলে ছিল, তিন জোট (৮ দল, ৭ দল, ৫ দল) কর্তৃক ১৯ নভেম্বর সংবিধানের আওতায় এরশাদ ও তার সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মুলাসহ একটি যৌথ ঘোষণা জাতির সম্মুখে উপস্থাপন যা “তিন জোটের রূপরেখা" নামে খ্যাত। ১৭ নভেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যায় ঢাকার মন্ত্রীপাড়া এবং সারাদেশে এরশাদ সরকারের দুর্নীতিবাজ এমপিদের বাসাবাড়ি ঘেরাও কর্মসূচী। ২৭ নভেম্বর বিএমএ (বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন) আহুত দেশব্যাপী চিকিৎসক ধর্মঘটের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মোড়ে এরশাদের ঘাতক বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণ হারান বিএমএ নেতা ডাক্তার শামসুল আলম মিলন। এ হত্যাকান্ড এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে

স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। ২৭ নভেম্বর রাতে সরকার দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এবং ঢাকা শহরে কারফিউ জারী করে। এসব উপেক্ষা করে জনগণ ও সংগ্রামী ছাত্র সমাজ আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তুলে। [২৯]
নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সবাই আন্দোলনের সমর্থনে একযোগে পদত্যাগ করেন। এরপর এক এক করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সংঘটিত হয় এরশাদ বিরোধী ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান। ৪ ডিসেম্বর এরশাদ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করেন। ৬ ডিসেম্বর তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে, এরশাদের দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটে। এরশাদের পতনের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গবেষণার লক্ষ্য :

বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশে আমরা বেশ কয়েকবার সামরিক শাসনের আবির্ভাব হতে দেখেছি। দেখেছি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সামরিক শাসকদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে। জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ছিলেন সুদীর্ঘ ৯ বছর। তার ক্ষমতা দখল ও শাসনামল সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য হলো ১৯৮২-১৯৯০ সময়কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা: বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়ণের চ্যালেঞ্জ"। এরশাদ সরকারের সময়কালে (১৯৮২-৯০) বেসামরিকীরণের ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা নিম্নরূপঃ

ক)

১. রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরুর অনুমতি : বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে 'ঘরোয়া রাজনীতি' এবং ১৪ নভেম্বর থেকে ‘প্রকাশ্য রাজনীতি' চর্চার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু, কয়েক দফায় তাকে এরূপ রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দিয়ে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করতে হয়।

২. ১৮-দফা কর্মসূচি : ১৯৮৩ সালের ১৭ মার্চ জেনারেল এরশাদ ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যা ছিল জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির অনুরূপ।

৩. স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন : ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহের এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সকল পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৪. গণভোট অনুষ্ঠান : ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে এরশাদের অধিষ্ঠিত থাকা এবং তার অনুসৃত নীতিমালা ও কর্মসূচির প্রতি জনগণের আস্থা বা সমর্থন আছে কি নাই তা ভোটারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, গণভোটে এরশাদের পক্ষে শতকরা ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট পড়ে। ফলাফল যা-ই দেখানো হোক না কেন, এতে যে খুবই স্বল্পসংখ্যক ভোটার অংশগ্রহণ করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫. উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠান : এরশাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিরোধী দলের বয়কট ও প্রতিরোধের কারণে ঐ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। পরে ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে এ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে এরশাদ উপজেলা পর্যায়ে একটি ক্ষমতার ভিত গড়ে তোলার সুযোগ পান।

৬. দল গঠন : বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে রাজনৈতিক দল গঠন। এ লক্ষ্যে প্রথমে এরশাদের এক মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। একই বছর ২৭ নভেম্বর এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে 'জনদল' নামে একটি দলের নাম ঘোষণা করা হয়। ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিষদ' এবং অন্যান্য দলের ক্ষুদ্র কিছু অংশ বা দলছুট ব্যক্তি এতে শামিল হয়। এরপর ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট জনদলের সঙ্গে আরো ৪টি ক্ষুদ্র দল (কাজী জাফরের ইউ.পি.পি, সিরাজুল হোসেন খানের গণতান্ত্রিক পার্টি, বি.এ.সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একটি অংশ এবং শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির একটি অংশ) মিলিত হয়ে 'জাতীয় ফ্রন্ট' নামে একটি জোট গঠন করে। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এদের একই দলে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে জাতীয় পার্টি গঠিত হয়। এরশাদ

আরো পরে (১৯৮৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর) এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন।

৭. জাতীয় সংসদ নির্বাচন : তিন দফা তারিখ পরিবর্তনের (২৭ মে ১৯৮৪, ৬ এপ্রিল ১৯৮৫, ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬) পর অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, জাসদ, মুসলিম লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে।

সারণি ১২ : ১৬৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলঃ

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৮
আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৫
এন.এ.পি	১০	৫	১.২৯
কমিউনিস্ট পার্টি	৯	৫	০.৯১
বাকশাল	৬	৩	০.৬৭
জাসদ (সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭
ওয়াকার্স পার্টি	৪	২	০.৫৩
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	১০	০	০.৭১
গণ আজাদী লীগ	১		০.০৮৮
৮ দলীয় জোট			
জামায়াত-ই-ইসলামী	৭৬	১০	৪.৬০
জাসদ (রব)	১৩৮	৪	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১০৩	৪	১.৪৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৬০০	৩২	১৭.৮৬
মোট	১৫২৭	৩০০	১০০

১

জাতীয় পার্টি মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি ও শতকরা ৪২.৩৪ ভাগ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ এককভাবে ৭৬টি আসন ও শতকরা ২৬.১৫ ভাগ ভোট লাভ করে সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট সর্বমোট ৯৭টি আসন এবং শতকরা ৩১.২১ ভাগ ভোট পায়। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ দাবি করে যে, নির্বাচনে জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আওয়ামী লীগ ও জোটের প্রার্থীদেরই জয়ী করেছিল, কিন্তু এরশাদ সরকার মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে সে বিজয় ছিনিয়ে নেয়। পর্যবেক্ষকদের মতে, এ দাবির যথার্থতা রয়েছে।এরশাদের পদত্যাগ ও একটি অর্থবহ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলসমূহ দুর্বার গণআন্দোলন এবং এক পর্যায়ে (নভেম্বর ১৯৮৭) একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে, ৬ ডিসেম্বর (১৯৮৭) এরশাদ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। পরের বছর ৩ মার্চ নতুন সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী

লীগ, বিএনপিসহ প্রধান বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচন বয়কট করে। ফলে তা এক প্রহসনে পরিণত হয়। নির্বাচন কমিশনের ফলাফল অনুযায়ী, এতে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন পেয়ে বিজয়ী এবং আ.স.ম. আব্দুর রবের নেতৃত্বাধীন সরকার অনুগত সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। বাকি আসনের ৩টি জাসদ (সিরাজ), ২টি (ফ্রিডম পার্টি) এবং ২৫টি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পান বলে দেখানো হয়।

৮. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন : ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে ছোট ছোট দল ও স্বতন্ত্র মিলে মোট ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান এবং সরকারি হিসেব অনুযায়ী বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন। [১০] কার্যত এটি ছিল এরশাদের অপর একটি অর্থহীন নির্বাচনী প্রহসন।[২]

খ)

এ সময়কালে গৃহীত বেসামরিকীকরনের পদক্ষেপগুলো গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল কিনা তার বিশ্লেষণঃ

১) বেসামরিকীকরণ পক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১লা এপিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতি এবং ১৪ নভেম্বর থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করেন কিন্তু, কয়েক দফায় তিনি কয়েক দফায় তিনি এরূপ রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করেন যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

২) ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের এবং ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সকল- পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যা গণতন্ত্রের সাথে কিছুটা সঙ্গতিপূর্ন।

৩) ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এটাতে খুব অল্পসংখ্যক ভোটার অংশগ্রহন করে যা গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ন নয়।

৪) ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যা প্রশ্নবিদ্ধ গণতন্ত্রের প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৫) ১৯৮৬ সালের ৭ মেজাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এই নির্বাচনে সকল রাজণৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহন করেনি যা গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপুর্ন নয়।

৬) ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রধান বিরোধিদল সমুহ নির্বাচন বর্জন করে যা গণতন্ত্রের বিরোধী।

পাদটিকাঃ

১। আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা, পৃ. ১৯৫।

২। ড. হারুন-অর- রশিদঃ বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, পৃষ্ঠাঃ৩৬২-৩৬৫

গবেষণার গুরুত্বঃ

সকল গবেষণার লক্ষ্য জ্ঞানের প্রচার করা। বাংলাদেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, গণতন্ত্রায়ন তত্ত্বের প্রভাব, কীভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হয় এবং কীভাবে তা রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে তা বোঝার ক্ষেত্রে এই গবেষণা একটি মাইলফলক । এই গবেষনা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেসামরিকীকরন ও গণতন্ত্রায়নের গবেষণায় নতুন জ্ঞানের দিশা দেখাবে। ইহার মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে যারা গণতন্ত্রের চেতনা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামজিক নিরাপত্তা, সুবিচার এবং অধিকারের জন্য **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাদের জন্য উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া যাবে। এই গবেষনা রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, একাডেমিক গবেষক, সংবাদকর্মীদের কে এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসনের কারণে দেশের গণতন্ত্রের ক্ষতিসাধনের ব্যাপকতা এবং পুনঃগনতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শাসনে কিভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানসমুহ স্ব স্ব সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্র ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সে বিষয়ে দেশের রাজনীতিক এবং সোস্যালএলিটদের কে পথ দেখাবে এই গবেষণা। দেশের রাজনৈতিকশ্রেনী, অভিজাতশ্রেনী এবং সামরিক বাহিনী প্রজাতন্ত্রের অধীনে গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে উদ্দিপ্ত আলোকরশ্মি হয়ে সে আলোর প্রতিফলন ঘটবে বিশ্বের সামিরিকীকৃত দেশগুলোতে এই গবেষনার মাধ্যমে।

গবেষণার পদ্ধতি:

এ গবেষণার জন্য মাধ্যমিক (Secondary) উৎস থেকেই তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য উৎস হলো এরশাদ সরকারের সামজিক আইন জারির ঘোষণাপত্র, বিভিন্ন অধ্যাদেশ, সরকারি গেজেট, দলের গঠনতন্ত্র, নির্বাচনী মেনিফেস্টো, বিভিন্ন প্রচারপত্র, গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনী, নির্বাচনি তফসিল, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তৎকালীন প্রক্ষাপটে প্রকাশিত পুস্তক। গবেষণা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহার করা হয়। এসব উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণার কাজ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের শাসনামলের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা শুধুমাত্র **১৯৮২-১৯৯০** সময়কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জ মুলতঃ আরো অতীত পরিস্থিতির সাথে জড়িত , বৃটিশ আমল থেকে গণতন্ত্রহীন পরিবেশে বন্দি থেকে **১৯৪৭** সালে স্বাধীনতা লাভ করলেও তৎপরবর্তী কালে পাকিস্থানী শাসকদের অগণতান্ত্রিকতার চর্চার শিকার এ দেশের জনগনের জন্য গণতন্ত্রায়নের সঠিক গবেষনার জন্য এ সময়কাল যথেষ্ট নয়। আবার **১৯৭১** এ দেশ স্বাধীনের পর **১৯৭৫** সালে পুনরায় গণতন্ত্রকে খেদিয়ে সামরিক বাহিনীর নিগড়ে বন্দি হওয়া পুনরায় গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে হোচট খাওয়া এসব ঘটনা ও বাংলাদেশে বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আলোচনার দাবি রাখে। তাছাড়া এই গবেষনাকর্মে দেশীয় পটভুমিতে তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সামরিক শাসন নিয়ে সীমিতাকারে আলোচনা করা হয়েছে এটিও এই অধ্যয়নের আরেকটি সীমাবদ্ধতা।

গবেষণার ক্ষেত্র

এ অভিসন্দর্ভের গবেষণা করতে গিয়ে রাজনৈতিক দল এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর নেতৃত্ব, সততা, দেশপ্রেম, সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশীয় কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের পাশাপাশি বহিঃবিশ্বের দেশগুলোর ইন্ধন ও প্রভাব সুস্পষ্ট হয়েছে গবেষণার মাধ্যমে। ভবিষ্যতে নতুন করে আবার আগের মতোই সামরিক শাসনের আবির্ভাব হতে পারে। সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্বার্থ ও উপাদান, সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থ ও উপাদান সম্পর্কে এ গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া সামরিক শাসন, রাজনৈতিক দল, নেতাদের সম্পর্কে বিভিন্ন দিকের ওপর বিশ্লেষণপূর্বক সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ও গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে দেশীয় স্বার্থান্বেষী মহল, বিদেশী গোষ্ঠীর স্বার্থ বাংলাদেশে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশীয় শক্তির পাশাপাশি বহিঃশক্তির প্রভাব ও স্বার্থ ব্যাপক। তাই বহিঃশক্তির প্রভাব ব্যাপকভাবে আলোচনার দাবি রাখা সত্ত্বেও অভিসন্দর্ভটির কলেবর একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে রাখার জন্য তা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যথার্থভাবে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতারা দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে যথাযথ বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারে এবং সামরিক শাসনের পথ বন্ধ করে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে।

সংক্ষিপ্ত সার ও অধ্যায় পরিক্রমা

বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন গণতন্ত্র। এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লাখো বাঙালি **১৯৭১** সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং অকাতরে জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। **১৯৭২** সালের সংবিধান অনুযায়ী দেশে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৭৫ সালের **১৫** আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। তারপরই মোশতাক আহমদ ক্ষমতায় আসীন হলেন। এরপর **১৯৭৫** সালের ৭ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসন নিয়ে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলেন। তিনি এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে **১৯৮১** সালের ৩০ মে নিহত হলে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। অতঃপর জেনারেল এরশাদ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে অপরাসণ করে। **১৯৮২** সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। শুরু হলো এরশাদের সামরিক শাসনামল, যা বিভিন্ন কলা-কৌশল, দমন পীড়ন, দুর্নীতি আর সামরিকীকরণের দীর্ঘ ৯ বছরের ক্ষমতা চর্চা। বিরোধী রাজনৈতিক জোট, দল, ছাত্র-জনতার আন্দোলন গণআন্দোলনের মাধ্যমে **১৯৯০** সালের ৬ ডিসেম্বর তার শাসনামলের অবসান ঘটে।

উপরে উল্লেখিত পটভূমিতে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি মোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ ভুমিকা , গবেষণার লক্ষ্য, গবেষণার গুরুত্ব, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, গবেষণার ক্ষেত্র এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল এবং বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ এবং বাংলাদেশে সামরিকীকরণের পটভূমি এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।
তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে **১৯৮২** সালে সামরিক শাসন জারির কারণ, এরশাদ সরকারের ক্ষমতায় আসার পটভূমি, যেভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।
চতুর্থ অধ্যায়ঃ এরশাদের ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড, জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রচেষ্টা ও বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া, এরশাদের সামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জ এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।
পঞ্চম অধ্যায়ঃ এরশাদের পতন ও এর কারণ, তার বিরুদ্ধে গনআন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার বিরুদ্ধে গনআন্দোলন এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, নির্বাচন **১৯৯১** এবং গণতান্ত্রিক সুশাসনের পথে পদক্ষেপ, এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।
সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্বাত্তিক আলোচনা ও বই পর্যালোচনা

২.১ সূচনা

অতি সাম্প্রতিককালে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ একটি অতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়া। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে এ প্রবণতা অধিকমাত্রায় লক্ষণীয়।[১]

একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বজায় রাখা সামরিক বাহিনীর পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমতাবস্থায় রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক ঘটনা। তথাপি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে এশিয়া, আফিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দুই-তৃতীয়াংশের ও বেশি দেশে কম-বেশি সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।[২]

বলা বাহুল্য, সামরিক বাহিনী যে কেবল উন্নয়নশীল তথা তৃত্বীয় বিশ্বের দেশ গুলোর ক্ষেত্রে প্রভাবশালী তা নয়, বরং উন্নত দেশগুলোতে রাষ্ট্রিয় নেতারা সামরিক বাহিনীকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারে না। তদুপরি বৃহৎ শক্তিবর্গের সামরিক প্রতিযোগীতা এ প্রবণতাকে আরো বাড়িয়ে করে তুলেছে। সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিন্যাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলেই দেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করেনি এমন উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যা বিশ্বে নেহায়েতই অল্প। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৫৮-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার ৪১টি রাষ্ট্রের মধ্যে ২১টিতে অর্থাৎ ৫৬ ভাগ রাষ্ট্রে, ল্যাটিন আমেরিকার ২০টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৩টিতে অর্থাৎ ৬৭ ভাগ রাষ্ট্র, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ২২টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৯টি রাষ্ট্রে অর্থাৎ ৪১ ভাগ রাষ্ট্রে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ১৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৬টিতে অর্থাৎ ৩৭ ভাগ রাষ্ট্রেই সামরিক বাহিনী রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে।[৩]

কোনো কোনো রাষ্ট্রে আবার বারবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান এক সমীক্ষায় বলেন, ১৯৬১ সালে বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহের শতকরা ১৯৬১ সালে বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহের শতকরা ১২ ভাগ সামরিক স্বৈরশাসনের অধীনে ছিল। ১৯৬৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯ ভাগ এবং ১৯৭৩ সালে বেড়ে হয় ২৭ ভাগ। এভাবে দেখা যায় ৭০ এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় ৫৬% দেশ সামরিক শাসনের অধীনে চলে যায়। তাই তিনি বলেন- “The Large Percentage of States that have fallen under military rule indicates the spread of political power wielded by the military in the third world.”[৪]

২.২ উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল এবং বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ:

এখন আমরা কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনী কিভাবে ক্ষমতা দখল করেছে এবং তাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া কিভাবে গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করেছে তা পর্যালোচনা করবো।

পাকিস্তান: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই সামরিকবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ শুরু করে।

ইস্কান্দার মির্জার ক্ষমতা দখল:

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইস্কান্দার মির্জা সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো- সংবিধান বাতিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বরখাস্ত, জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া, সকল রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা এবং জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা। এ কাজগুলি সবই গণতন্ত্র বিরোধী এবং গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল:

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে ইস্কান্দার মীর্জা সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারের আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। এটি যে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেন তা নয়। আইয়ুবের এক ধরণের চাপের মুখে তিনি তা করতে বাধ্য হন। জেনারেল আইয়ুবের উচ্চাভিলাষ সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। জেনারেল আইয়ুব যখন পূর্ব পাকিস্তান সফরে তখন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা লেঃ জেনারেল মুসাকে জেনারেল পদে প্রমোশন দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন। এছাড়া, তিনি আরো কিছু পদক্ষেপ নেন যা দ্বারা বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্রিয় রয়েছেন। জেনারেল আইয়ুবের মনে এরূপ ধারণা জন্মানো অমূলক ছিল না যে, সুযোগ পেলেই ইস্কান্দার মীর্জা তাকে সরিয়ে দিতে পারেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার এরূপ কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগেই তাঁর সামরিক শাসন জারি মাত্র ২০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর (১৯৫৮) জেনারেল আইয়ুব চারজন জেনারেলকে সশস্ত্র অবস্থায় পাঠিয়েই ইস্কান্দার মীর্জার পদত্যাগ আদায় করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পরের দিন সস্ত্রীক বিমানযোগে লন্ডন পাঠিয়ে দেন। জেনারেল আইয়ুব একই সঙ্গে নিজেকে প্রেসিডেন্ট করেন।[৫]

আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের কারণঃ আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের কারণগুলি নিম্নরূপ-

আইয়ুবের মানসিক গঠন ও সামরিক জীবনের পটভূমি:

জেনারেল আইয়ুব ছিলেন একজন পাঠান। গ্রেট ব্রিটেন থেকে তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ১৯৪৭-৪৯ এ তিনি পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এডজুট্যান্ট জেনারেল ছিলেন। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৪ সালে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হলে, তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তাতে অন্তর্ভুক্ত হন। এভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি পাকিস্তানের

রাজনীতির গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভের সুযোগ পান। একই সময় এ ব্যাপারে তার নিজস্ব ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়। তাই, ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর তার ক্ষমতা দখল বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এ ছিল তাঁর 'এক মহাপরিকল্পনার অংশ বিশেষ, যার ছক তিনি বহু পূর্বে (১৯৫৪) লন্ডনে এক হোটেলের নির্জন কক্ষে বসে এঁকেছিলেন বলে পরবর্তীকালে আত্মজীবনীতে দাবী করেন।[৬]

প্রাক-মার্কিন চুক্তিঃ

১৯৫৪ সালে পাক-মার্কিন চুক্তির ফলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এক দিকে যেমন প্রচুর অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহে সক্ষম হয়, অন্যদিকে তেমনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক বেশি সংহত হয়ে ওঠে।

অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থাঃ

১৯৫৫-১৯৫৮ পর্যায়ে দেশের দু'অংশেই, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে, রাজনৈতিক দলের অবস্থান ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। বিভিন্ন উপদলীয় কোন্দলে শতধা বিভক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ এক অর্থে বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

মুসলিম লীগের শোচনীয় অবস্থাঃ

পাকিস্তনের দুই প্রদেশের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের প্রতীক হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগের অবস্থা হয়ে ওঠে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও অধিকাংশ মুসলিম লীগ সদস্য রিপাবলিকান দলে যোগদান করলে সেখানেও মুসলিম লীগের অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

আমেরিকান পরোক্ষ-সমর্থনঃ

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছিল বলেও অনেকে মনে করেন।

অন্যান্য কারণঃ

এ সময়ে কতকগুলো ঘটনা ঘটে তার পরোক্ষ প্রভাবও পাকিস্তানে সামরিক শাসনের পথ প্রশস্ত করে। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের অধিবেশন চলাকালে পরিষদে মারামারি এবং শেষ পর্যায়ে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যু, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলন, প্রাদেশিক পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মন্ত্রিত্বের প্রতি সীমাহীন লোভ, দলীয় নেতৃবৃন্দের সীমাহীন দুর্নীতি প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য।

জেনারেল আইয়ুব খানের বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জ:

জনগণের বৈধতা আদায়ের জন্য জেনারেল আইয়ুব খান নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করেন-

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশঃ

১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সমগ্র পাকিস্তানে 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' জারি করেন এবং ইউনিয়ন পর্যায় থেকে প্রাদেশিক উপদেষ্ঠা পরিষদ পর্যন্ত চার স্তর বিশিষ্ট মৌলিক গণতন্ত্র-ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ, বিভাগীয় পরিষদ সংগঠন করেন। মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন সমাপ্ত হলে ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন কমিটি ও টাউন কমিটি থেকে নির্বাচিত ৮০,০০০ (আশি হাজার) মৌলিক গণতন্ত্রী **১৯৬০** সালের **১৪** ফেব্রুয়ারি জাতির পক্ষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি আস্থা আপন করেন। এ আস্থাসূচক ভোটে আইয়ুব লাভ করেন শতকরা ৯৫.৬২ ভাগ ভোট**।** পাকিস্তানের জন্যে সংবিধান রচনার নির্দেশ এভাবে তিনি লাভ করেন।

১৯৬২ সালের আইয়ুবি সংবিধানঃ

১৯৬০ সালের **১৭** ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস শাহাবুদ্দীন কে চেয়ারম্যান করে একটি সংবিধান কমিশন গঠন করা হয়। পাকিস্তানের জন্য একটি ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়ন ছিল এ কমিশনের মূল দায়িত্ব। **১৯৬১** সালের ৬ মে কমিশনের রিপোর্ট পাওয়াযায়। **১৯৬১** সালের ৬ মে কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া যায়। ২৪-৩**১** অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত গভর্নরদের সম্মেলনে এ রিপোর্ট পর্যালোচনা শেষে একটি সংবিধান তৈরি এবং **১** মার্চ (**১৯৬২**) তা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়। এটি আইয়ুবি সংবিধান নামে পরিচিত। ইসলামী প্রজাতন্ত্র, মৌলিকগণতন্ত্র, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের অনুপস্থিতি, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব প্রভৃতি ছির এ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য। আইয়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম সহযোগী ছিল মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা, জেনারেল আইয়ুব রাজনৈতিক দলের প্রভাবকে ভয় পেতেন**।** তাই মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তার ক্ষমতার ভিত্তিকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে এনে তার অন্যায় কাজের জন্যেও যেন কোন প্রতিবাদ না উঠতে পারে মৌলিক গণতন্ত্র এ কাজে তাঁকে সহযোগীতা করে। আর **১৯৬২** সালের সংবিধান ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন। এভাবে জেনারেল আইয়ুব খান বেসামরিকীকরণের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রশ্নে বিমাতাসুলভ স্বৈরাচারী আচরণেই বাঙালিকে আলাদা রাষ্ট্রের চিন্তার উদ্বুদ্ধ করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের **১১** দফার মধ্যে বাঙালি তার স্বপ্নের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিল। **১৯৬৯** সালে শুরু হয়গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান। এ পর্যায়ে আইয়ুব খান কোন গত্যন্তর না দেখে ২৪ মার্চ **১৯৬৯** তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন:

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান **১৯৬৯** সালের ২৫ শে মার্চ দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন প্রবর্তন করে সংবিধান বাতিল করেন। তিনি ঘোষণা করেন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তিনি সৈনিকের ব্যারাকে ফিরে যাবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হয় ১৯৭০ সালের নির্বাচন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামীলীগ জয় লাভ করলেও তিনি ক্ষমতা ছাড়তে গড়িমসি করেন। পরে ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ কালো রাতে নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমন করে এবং বঙ্গবন্ধুকে ধরে কারাগারে নিয়ে যায়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের বিনিময়ে আমরা ফিরে পাই আমাদের স্বাধীনতা। তাই বলা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে সামরিক শাসক ক্ষমতায় এসেছেন তারা বেসামরিকীকরণের নামে গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ:

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার সূচনা লগ্ন হতেই ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকার্নো প্রভূত ক্ষমতার মাধ্যমে তার প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু ১৯৫৯ সালে তিনি ইন্দোনেশিয়া যখন হতে অনিশ্চিত এবং বিপদজনক দ্বিতীয় দশকে পদার্পণ করে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে, তখন হতেই ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ সামরিক বাহিনী এবং সামরিক বাহিনীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অপরাপর এলিট এবং ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বিমানবাহনী এবং পদাতিক বাহিনীর অফিসারগণ কমিউনিষ্ট পার্টি এবং চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের পাশপাশি ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার একটি বড় উৎস হিসাবে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। বেসামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে ১৯৫৫ সাল হতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা মূখ্যতঃ বিমুখী হয়ে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী দেশ রক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে থাকে। লক্ষনীয় যে, ১৯৪৫ সালে শাসনতন্ত্র যখন প্রণয়ন করা হয় তখনও সেনাবাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সুতরাং ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে হিসাবে গঠিত হবার পর হতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ পায়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইন্দোনেশিয়াতে সুকার্নো জীবিত থাকাকালীন সময়েই সামরিক বাহিনী সরকারের আড়ালে থেকে নীতি নির্ধারণী ও প্রাশসনিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ইহার প্রধান কারণ হল সেনাবাহিনী সুকার্নোর সম্মোহনী নেতৃত্বকে অতিক্রম করে সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীর নির্দেশনা মূলত: তিনটি উৎস হতে আসে। অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ১৯৪২ সালের পূর্বে ডাচদের দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নীতি নির্ধারনী সংস্থা হিসাবে শক্তিশালী রূপ গ্রহণ করে। অপর একটি ব্যাপক অংশ ১৯৪৩ সাল হতে ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে জাপানীদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় গ্রুপটি ১৯৪৪-১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময় হতে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করলেও ক্রমশঃ ইহা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৫৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই নির্বাচন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন সমাধান না এনে বরং রাজনৈতিক সমস্যাকে আরও তীব্র করে তোলে। যদিও সুকার্নো এই সময় সেনাবাহিনীকে রাজনীতি হতে প্রত্যক্ষভাবে দুরে রাখতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর পরোক্ষ চাপ ও হস্তক্ষেপের ফলে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি করে। এ সময় বিভিন্ন কারণে সুকার্নো ও তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি হাত্তার মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে হাত্তা পদত্যাগ করেন। কিন্তু এর ফলে ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক

সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কারণ এই কোন্দলের পরিপ্রেক্ষিতে জাতা ও অপরাপর দ্বীপগুলিতে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দেয় এবং সুমাত্রায় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৫৭ সালের ১ই মার্চ জরুরী অবস্থাকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সময় ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক শাসন জারী করা হয়। এর ফলেও সুকার্নো এবং সামরিক বাহিনী তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পায়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সুকার্নো প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সুতরাং তার এই নির্ভরশীলতা ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে আঁতাত সৃষ্টি হবার ফলেও সেনাবাহিনী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ পায় ।[৭]

মায়ানমারে (বার্মা নামেও পরিচিত) সামরিক শাসনঃ

মিয়ানমার একটি গণতান্ত্রিক জাতি হিসাবে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বার্মিজ ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মির অধীনে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর, একটি সাংবিধানিক সরকার গঠিত হয় এবং উ নুকে স্বাধীন মিয়ানমারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয়। যাইহোক, U Nu-এর অধীনে নবগঠিত বেসামরিক সরকার দেশীয় সমস্যা, জাতিগত সমস্যা, বিদ্রোহ, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া জাতিগত বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়ে দেশের ঐক্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। 1958 সালে, AFPFL-এর মধ্যে একটি বিভক্তি ফিল্ড অফিসারদের দ্বারা একটি অভ্যুত্থান উস্কে দেওয়ার হুমকি দেয়। পরিস্থিতির নিষ্পত্তি করার জন্য, U Nu একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য সামরিক বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানায়।

১৯৫৮-৬০ সালে জেনারেল নে উইনের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রাথমিকভাবে একটি যোগ্য রাষ্ট্র গড়তে আগ্রহী বলে মনে হয়েছিল। এটি দুর্নীতি হ্রাস করেছে, আমলাতান্ত্রিক দক্ষতা উন্নত করেছে এবং পকেট আর্মিদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। সামরিক জান্তা 1960 সালে একটি নির্বাচন করার ঘোষণা দেয়।

১৯৬০ সালের নির্বাচনের পর, U Nu এর দল একটি বেসামরিক সরকার গঠন করে। কিন্তু U Nu-এর অধীনে বেসামরিক সরকার পরিস্থিতির সমাধান ও উন্নতি করতে পারেনি, এবং বরং দেশের জাতীয় সংহতিকে হুমকির মুখে ফেলেছিল, যার ফলে জেনারেল নে উইনের অধীনে ২ মার্চ, ১৯৬২-এ অভ্যুত্থান ঘটে। অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, নীতিগতঅচলাবস্থা, ব্যাপক আকারে একাধিক বিদ্রোহ এবং ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির মিশ্রণ। অভ্যুত্থানের পর, সামরিক সরকার সরকারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে, সংবিধান স্থগিত করে এবং ডিক্রি দ্বারা মিয়ানমারকে শাসন করার জন্য একটি ইউনিয়ন বিপ্লবী কাউন্সিল (আরসি) নিয়োগ করে।

২ মার্চ ১৯৬২-এর অভ্যুত্থানের ফলে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মিয়ানমারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবসান ঘটে এবং সরাসরি সামরিক শাসনের সূচনা হয়। জেনারেল নে উইনের অধীনে সামরিক শাসনের সময় দেশটি একদলীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপ নেয়। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন দলটি ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টি (বিএসপিপি) নামে পরিচিত। এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৮৮ সালকে নে উইনের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১৯৬২ থেকে ১৯৮৮ সময়কালকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়টি হল ১৯৬২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সরাসরি সামরিক শাসনের সময়কাল এবং ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সাংবিধানিক একনায়কত্ব পর্ব।

২০১১ সালে, ২০১০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সামরিক জান্তা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং একটি নামমাত্র বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থাৎ মিয়ানমারের স্বাধীনতার কিছুকাল পর থেকেই সেখানে সামরিক শাসন চালু হয়, প্রথম সামরিক শাসন শুরু হয় ১৯৫৮ সালে এবং সরাসরি সামরিক শাসন শুরু হয় যখন নে উইন ১৯৬২ সালে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টির অধীনে একটি সামরিক একনায়কত্বে পরিণত হয় যা ২৬ বছর ধরে দেশকে বাঁচানোর দাবিতে চলে।

পরে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনরায়, তাতমাড়ু স্টেট কাউন্সেলর অং সান সুচি, প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট এবং অন্যান্য সরকারী নেতাদের আটক করে। তারপরে তারা সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিতে এগিয়েযায়, এবং বার্মার সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ, মিন অংহ্লাইং, দেশের নেতা হিসাবে, রাষ্ট্রের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনের সাথে এক বছরের জরুরি অবস্থা চালু করে। প্রশাসনিক পরিষদ, যিনি একটি নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নতুন উপাধি গ্রহণ করেছেন।[৮]

২.৩ বাংলাদেশে সামরিকীকরণের পটভূমিঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে এ ভূখন্ডের মানুষ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল। দেশবাসী ভেবেছিল বিদেশী শাসন শোষণ থেকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে যেখানে শোষন, বন্টন, বৈষম্য ও নির্যাতনের অবসান হবে, শোষণহীন সমাজ নির্মিত হবে। কিন্তু জনগণের এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করার আগেই একদল ঘাতক রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার পরিবার পরিজনকে হত্যা করে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের উৎখাত ও সামরিক স্বৈরশাসনের সূত্রপাত করে। তারপর থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। দেশের কখনো সামরিক শাসন এসেছে, আবার কখনো বেসামরিক পোষাকে স্বৈরাশাসকের আবির্ভাব ঘটেছে। সামরিক সরকার অথবা সামরিক বাহিনী সমর্থিত স্বৈরাচারী সরকার দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকার ফলে দেশে স্বেচ্ছাচারিতা নিরঙ্কুশ হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে একদল লুটেরা, পদলেহী চাটুকার দলের সৃষ্টি হয়েছে, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করার সঙ্গে গড়ে তুলেছে ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড়। বাংলাদেশে কয়েকবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। প্রথমবার খন্দকার মোস্তাক আহমেদ কর্তৃক ২০ আগস্ট ১৯৭৫-এ জারিকৃত এক আদেশ বলে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন কার্যকর হয়। দ্বিতীয়বার, প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মাদ সায়েম ৮ নভেম্বর ১৯৭৫-এ জারিকৃত এক আদেশবলে দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেকে প্রধান আইন প্রশাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। তৃতীয়বার মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ২৯ নভেম্বর ১৯৭৬ এ সামরিক আইন জারি করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ৬ এপ্রিল ১৯৮০ পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকে। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ দেশে চর্তুথ দফা সামরিক শাসন জারি করা হয়। এই সামরিক শাসন জারির বেশ কিছুদিন আগে থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকান্ড, বিচারপতি সাত্তারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, বিএনপি'র প্রকাশ্য চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব, সামরিক শাসনের পক্ষে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলে অপ্রকাশ্য সমর্থন ঘোষণা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে একটি প্রেক্ষাপট রচিত হয় সামরিক শাসনের পক্ষে।

প্রথমবার খন্দকার মোস্তাক আহমেদ কর্তৃক ২০ আগস্ট ১৯৭৫- এ জারিকৃত এক আদেশবলে প্রথম সামরিক আইন কার্যকর হয় । দ্বিতিয়বার আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ৮ নভেম্বর ১৯৭৫ এ জারিকৃত এক আদেশবলে দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। তৃতীয়বার মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান হন। নভেম্বের ১৯৭৬ এ সামরিক আইন জারি করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকে চতুর্থবার লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২৪ মার্চ ১৯৮২ তে চতুর্থবারের মতো দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ১০ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন কার্যকর থাকে।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্রগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন সংবিধান অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার (বয়স ৭৩) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করেন। সে সময়ে সেনাবাহিনীর

চিফ অব স্টাফ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এবং বিভিন্ন সেনাছাউনির সমর্থনে বিচারপতি সাত্তার সেনা বিদ্রোহ দমনে সফল হন। আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বেসামরিক শাসনের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে, যা বিদ্রোহ দমনে বৃদ্ধ সাত্তারকে শক্তি ও সাহস জোগায়, সংবিধানের ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রপতির শুন্যপদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরনে সাত্তার শীঘ্রই উদ্যোগ গ্রহন করেন। কিন্তু তার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য সংবিধানের সংশোধনী প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কেননা তিনি উপরাষ্ট্রপতি থাকা কালে প্রজাতন্ত্রের কর্মে লাভজনক পদে অধিষ্টিত ছিলেন, তাই সংবিধানের ৬৬ ধারার ২ উপধারা অনুযায়ী তিনি নির্বাচনে প্রার্থি হওয়ার অযোগ্য। **১৯৮১** সালের ৮ জুলাই জাতিয় সংসদে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী পাশ হয়। এর দ্বারা উপ-রাষ্ট্রপতির পদ লাভজনক পদ নয়, ঘোষণা করা হয়। ফলে বিচারপতি সাত্তারের প্রার্থি হওয়ার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকলনা **১৯৮১** সালের **১৫** নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট **৩১** জন প্রার্থিপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ক্ষমতাসীন বিএনপি প্রার্থী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস এবং আওয়ামীলীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেনের মধ্যে। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন।

১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফলঃ

দলেরনাম	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্তভোট (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	বিচারপতি আব্দুস সাত্তার	৬৫.৮০
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	ড. কামাল হোসেন	২৬.০৫
অন্যান্য	স্বতন্ত্র	৮.১৫
মোট		১০০

৯

২.৪ উপসংহারঃ

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনারেল এরশাদ’ ৮১-র ২১ নভেম্বর বিবিসি’র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন: সরকারে সেনাবাহিনীর একটি ভূমিকা নিশ্চয়ই থাকবে। রাষ্ট্রপতি সাত্তার একটি কমিশন গঠন করেছেন। এই কমিশনের কাজ হবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কি হবে তা নির্ধারণ করা।

আসলে এটাই ছিল সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের পূর্বাভাষ ও চূড়ান্ত ইঙ্গিত। আর এই বক্তব্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভবিষ্যতে ভূমিকা কি হবে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

পাদটিকাঃ

১. মোঃ আব্দুল ওদুদ ভুইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, এপ্রিল ২০০১, পৃঃ ৪৮১।

২. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, সামরিক জান্তার রাজনীতি, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃঃ ৪০-৪২।

৩. মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীর বিক্রম, একজন জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা-১০৮। Talukdar Muniruzzaman, The Bangladesh Revolution and its after math, University press Ltd., Dhaka-1988, p-188, 203-234

৪. এমাজউদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংকট, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৫৬।

৫. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৯৫৭-২০০০), নিউ এজ পাব্লিকেশন্স, পৃষ্ঠা- ২২১-২২২।

৬. ড. হারুন-অর-রশিদ বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা-২২২

৭. উইকিপিডিয়া

৮. উইকিপিডিয়া

৯. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৬ষ্ঠ সংস্করন, ঢাকা ১৯৯৭, পৃঃ ৬৬৪-৬৫।

তৃতীয় অধ্যায়

এরশাদের ক্ষমতায় আরোহন

৩.১ সুচনা

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে বন্দুকের নলের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। সামরিক অভ্যুত্থান কোথাও অকস্মাৎ ঘটে না, অভ্যুত্থানের পূর্বে অনেক লক্ষণ সমাজে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, তীব্র গণ অসন্তোষ, দলীয় পর্যায়ে অসহিষ্ণুতা, সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম, সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি ব্যাপক ভিত্তিক হয়ে ওঠে। একটা সচেতন নিরীক্ষার পরই অভ্যুত্থান ঘটে এমন সময়ে যখন সামরিক কর্মকর্তারা নিশ্চিত হন যে সামরিক শাসন প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে না। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারির বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকান্ড, বিচারপতি সাত্তারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, বিএনপির মধ্যে প্রকাশ্যে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে একটি প্রেক্ষাপট রচিত হয় সামরিক শাসনের পক্ষে।[১]

তবে কোনো দেশে সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রথমত, সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্ব, দ্বিতীয়ত, সামরিক বাহিনীর সার্বিক স্বার্থ। তৃতীয়ত, দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন্দল ও দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক এলিটদের জনপ্রিয়তা হ্রাস।[২]

৩.২ বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির কারণঃ

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশের সামরিক শাসন জারিকে নিম্নোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ

প্রথমত, বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তারা যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন তা প্রমাণিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট, ৩রা নভেম্বর, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ও ১৯৮১ সালের ৩০ মের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার প্রত্যেকটি সংগঠিত হয় সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা। ৩০মের ঘটনা এদিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ ঘটনার পর সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভাব প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে।

দ্বিতীয়ত, যে কোনো দেশের সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠানিক ও সার্বিক স্বার্থ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকে। মূলত: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম লাভ করলেও এ দলটি সে সময় সুসংহত রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়নি। জন্মক্ষণ থেকে এ দল ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছুসংখ্যক নেতার সম্মিলিত প্লাটফর্ম মাত্র। পিকিংপন্থী জাতীয় আওয়ামী পার্টির একাংশ ও মুসলিমলীগইউপিপি দলের একজন নেতা, বাংলাদেশ শ্রমিক দলের কিছু কর্মী এবং তফসিলি ফেডারেশনের সহযোগে গঠিত বাংলাদেশ। জাতীয়তাবাদী দলটি ২টি সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্ব এবং অন্যটি ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার আকর্ষণ।[৩]

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তাই জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। দলীয় সংহতি রক্ষার্থে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হয়। যদিও বয়স ও কর্মক্ষমতা কোনো দিক থেকেই তিনি রাষ্ট্রপতি গুরু দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন না। কারণ তার বয়স ছিল ৭০-এর অধিক। সর্বক্ষেত্রে নিজে উপস্থিত হয়ে তার পক্ষে সকল সমস্যা পর্যবেক্ষণ করা খুব দুরহ ছিল। সুতরাং শক্ত ভাবে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যক্তি হিসেবে প্রেসিডেন্ট সাত্তারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে নির্বাচনের পর মন্ত্রী পরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে দলীয় কোন্দল আরো বৃদ্ধি পায়। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। জিয়া সরকারের বেশিরভাগ সদস্যের সততা সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। বেশ কিছুসংখ্যক মন্ত্রীর দুর্নীতির বিষয়ে অনেক তথ্য খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রি পরিষদে যোগদানের পর অনেকেই দূর্নীতির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সর্বমোট ১৪ মন্ত্রীর দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। এসব মন্ত্রীর মন্ত্রীপরিষদে যোগদানের পূর্বে বাড়ি গাড়ি ও অর্থ সম্পদ তেমন কিছুই ছিল না। মন্ত্রীদের এ ব্যাপক দূর্নীতির বিষয়টি প্রকাশিত হলে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ২টি গোয়েন্দা সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ দেন। কিন্তু গোয়েন্দা রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই তিনি নিহত হন। বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই এ তদন্তকার্য সমাধা করার নির্দেশ দেন।[৪]

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি হলো ওই সময়ে তৎকালীন যুবমন্ত্রী আবুল কাশেমের মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে একটি চমকপ্রদ ঘটনার সৃষ্টি হয়। প্রায় ৬ ঘন্টাকাল যুবমন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাও করে

বিকাল ৪ টায় উর্ধ্বতন প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নাখালপাড়ার আলী হোসেন হত্যা মামলার আসামি এমদাদুল হক(ইমদু)কে গ্রেফতার করে। ইমদুকে গ্রেফতারের আগে পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র সাদা পোশাকধারী লোকেরা আশপাশের বাড়ির ছাদ, গ্যারেজ ও প্রাচীরের ওপর অবস্থান নিয়ে সকাল ১০টা থেকে অপেক্ষা করতে থাকে। এ এলাকায় অবস্থিত কয়েকজন বিচারপতির বাড়ির আঙিনায় ও ছাদে পুলিশ অবস্থান গ্রহণ করে। যুবমন্ত্রী আবুল কাশেম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুল মতিনের সঙ্গে আলোচনার পর ইমদুকে গ্রেফতারের অনুমতি দেন। যুবমন্ত্রীর আপত্তির মুখে উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির বিশেষ অনুমতিক্রমে ইমদুকে গ্রেফতার করে।[৫]

ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন সরকারের জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। মন্ত্রীর বাসভবনে আশ্রয়লাভকারী এ ধরনের একজন খুনিকে গ্রেফতারের ফলে মন্ত্রিসভা নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য, অনুগত্য, ন্যায়পরায়নতাও দেশপ্রেম সম্পর্কে জনগনের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। মাত্র ৪ মাস সময়ের মাঝে রাষ্ট্রপতি সাত্তার কর্তৃক ২ বার মন্ত্রিপরিষদ গঠন সরকারের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে। এ সময় দূর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সাধারণ ব্যাপার হয়ে ওঠে। বিচারপতি সাত্তার নিজেই বলেন, র্সবোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গুরু দায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের অনেকেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও অবহেলা,ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টা, দেশের মঙ্গল সম্পর্কে নির্লিপ্ততা এবং দূনীতিপরায়ণতার ফলে দেশের সামগ্রিক অবনতি ঘটেছে।[৬]

জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা আরো সংকটজনক হয়ে ওঠে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জানুয়ারিতে (মাত্র ১৯৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। এসরকার দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি কাটছাঁট করতেই দেশের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। চট্টগ্রামের ছত্রিশ গুদাম থেকে কোটি টাকার খাদ্যশস্য উধাও হয়ে যায়।[৭]

এসব খাদ্যশস্য পাচারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা উদঘাটিত হলে জনমনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এভাবে দেশে দ্বিতীয় বার সামরিক শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাসন ব্যবস্থাকে বেসামরিকীকরণের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ তা ছিল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে। ফলে সামরিক কর্মকর্তাদের শাসন ব্যবস্থা ও সরকারের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান ছিল। বিএনপি সরকারের দুর্বলতা ও জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুযোগে এরা প্রকাশ্যভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৮২ সালের সামরিক আইন জারির ঘোষণা পত্রে জেনারেল এরশাদ উল্লেখ করেন, "যেহেতু দেশে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে যখন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেসামরিক প্রশাসন আইন কার্যকর ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। সর্বস্তরে সীমাহীন দূর্নীতি জীবনের অংশ হয়ে ওঠায়, জনগণের জন্য দুর্বিষহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিতে। জনসাধারণের সম্মানজনক জীবনযাপন, শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলেছে। রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। যেহেতু দেশের জনগণ চরম দিশেহারা

অবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত। যেহেতু জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর দায়িত্ব বর্তেছে। যেহেতু আমি লে.জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত এবং আমাদের মহান দেশ প্রেমিক জনগণের আশির্বাদ নিয়ে ২৪ মার্চ ১৯৮২ বুধবার হতে বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সব ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছি এবং এ মুহূর্তে থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে সামরিক আইনের আওতাভুক্ত বলে ঘোষণা করছি। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমি বাংলাদেশের সব সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছি।” [৮]

ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার ২৫ মার্চ অপরাহ্নে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত এ ভাষনে সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য কামনা করে বলেন, দেশের আইন শৃঙ্খলা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে, জাতীয় স্বার্থে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

জেনারেল এরশাদ দেশে সামরিক শাসন জারির পক্ষ সমর্থন করে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের কথা উল্লেখ করেন। যাতে তিনি বলেছিলেন, ‘সমাজ জীবনে আজ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, যার যত ক্ষতি করার ক্ষমতা তার তত বেশি প্রতিপত্তি। সমাজে যারা সৎ ও ভালো মানুষ তারা বড় অসহায় অবস্থায় কাল কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। ধীরে ধীরে ভালো মানুষেরা জনজীবন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন। ফলে সমাজে অসৎ ও দূর্নীতিবাজদের দাপট ও প্রতিপত্তি বেড়েই চলছে। আজ আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের এমন এক ভয়াবহ অবস্থা ঘটেছে যে সাহসিকতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে আমাদের সম্মান বিপন্ন হয়ে পড়বে। জেনারেল এরশাদ বলেন, জাতীয় এ দুর্যোগের দিনে সেনাবাহিনীর নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। আর তাই সামরিক শাসন হয়ে পড়েছে অত্যাবশ্যক।”[৯]

১৯৮২ সালের সামরিক শাসন জারির কারণ সম্পর্কে সরকারি ভাষ্য বর্ণনা করা হলো। এছাড়া ওই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ২টি সাক্ষাৎকার অংশ তুলে ধরছি। তাহলোঃ

১। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকেই এরশাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। আর তাই সুযোগ বুঝে নানা কারণ উপস্থাপন করে ক্ষমতা দখল করেন। অর্থাৎ ক্ষমতার মোহই ছিল ১৯৮২ সালের সামরিক শাসন জারির প্রধান কারণ।[১০]

২। ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের দুর্বলতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি অর্থনৈতিক সংকট এবং ক্ষমতাসীন সরকারের অদূরদর্শিতাই রাজনীতিতে সামরিক শাসন আগমনের প্রত্যক্ষ কারণ বলে প্রতীয়মান।[১১]

মূলতঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মোহ থেকেই রাজনীতিতে সামরিক শাসকদের আগমন ঘটে। তথাপি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে,

মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি চরম পর্যায়ে পৌছতে থাকে। তখন সেনাবাহিনী ও ব্যারাকে বসে থাকে না, তারা রাজনীতিতে নিজেদের অধিকার দাবি করে এবং পরবর্তী সময়ে দেশ রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বেসামরিক সরকারের ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করতেপারি এবং বাংলাদেশে পরপর সামরিক অভ্যুত্থান এবং **১৯৮২** সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে এসব কারণ ক্রিয়াশীল ছিল বলে ধরে নিতে পারি। তথাপি **১৯৮২** সালের অভ্যুত্থানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এটি সুপরিকল্পিত এবং পূর্বে বাংলাদেশে যেসব অভ্যুত্থান ঘটেছে সেগুলোর মতোহঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা অভ্যুত্থান এটি নয়, সময় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় লাভ-লোকসানের মূল্যায়ন করেই এর পরিকল্পনা করা হয়। তাছাড়া এ অভ্যুত্থানের সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ যতটুকু জড়িত ছিল তার থেকে অনেকগুণ বেশি ছিল জেনারেল এরশাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা ও উচ্চাভিলাষ।

৩.৩ এরশাদ সরকারের ক্ষমতায় আসার পটভূমিঃ

দীর্ঘ দুইশ বছর ইংরেজ শাসন ও তেইশ বছর পাকিস্তানী শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি দেশের জন্ম হয়। একটি বলিষ্ঠ জাতী হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য দেশের আপামর জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যে উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪০ বছর পরও তা জাতি অর্জন করতে পারেনি।

এরশাদের পূর্বে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপঃ

গণতন্ত্রকে সামনে রেখে দেশ এগিয়ে চলার শপথ নিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথম সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। এটি কোনও সামরিক অভ্যুত্থান নয়। এর সাথে প্রতিষ্ঠানগত ভাবে সামরিক বাহিনীর কোন সংশ্রব ছিলনা। সামরিক বাহিনীতে চাকরিরত এবং বিভিন্ন অভিযোগে চাকুরিচ্যুত জুনিয়র অফিসারদের আনুমানিক ১৫০০ জন সদস্য এর সাথে যুক্ত ছিল। এটি প্রধানত ছিল ব্যক্তিগত ক্রোধ এবং দেশিবিদেশি ষড়যন্ত্রের ফল । এর নির্মম শিকার স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার পরিবারের উপস্থিত সব সদস্য মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী আরও অনেকে। ঐ অফিসারদের হাতে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতা সৈয়দ তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান। এভাবে মুক্তিযুদ্ধর চেতনা বিরোধী শক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিজেদের অধিষ্ঠিত করে। দেশের সংবিধান বাতিল করা না হলেও সামরিক শাসন জারী করা হয়।

১৫ই অগাস্ট ক্ষমতা দখল করে খন্দকার মোস্তাক আহমদ কে কিছুদিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে সম্মুখে রাখা হলেও মূল ক্ষমতা ছিল তরুণ অফিসারদের হাতে। এ নিয়ে শীঘ্রই সামরিক বাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দেয়। সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ১৫ই আগস্ট ও ৩ নভেম্বর হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত অনেককে বিদেশে যেতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু খালেদ মোশাররফ মাত্র চারদিন ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হন। ৭ ই নভেম্বর সিপাহী জনতার এক পাল্টা অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন এবং জেনারেল জিয়া ক্ষমতাসীন থাকাকালীন (১৯৭৫-৮১) অন্তত বিশবার তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ। এর সাথে যুক্ত থাকার কথিত অভিযোগে অনেককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সাড়ে পাঁচ বছরের মতো দেশ শাসনের পর ১৯৮১ সালের ৩০ মে জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে এক ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে মর্মান্তিক ভাবে নিহত হন। এরপর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কিছুকাল দেশ পরিচালনা করেন।

৩.৪ যেভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদঃ

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত বিএনপি সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। ভেঙ্গে দেয়া হয় জাতীয় সংসদ সংবিধান স্থগিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয় অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি আহসানউদ্দিন কে এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং অপর দুই বাহিনী প্রধানরা উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার দৃশ্যত এরশাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান।[১৭]

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করে দেশে সামরিক আইন জারী করেন। এ সামরিক শাসন যে প্রেক্ষাপট তা দুএক মাস ষড়যন্ত্র করে তৈরি করেননি। এজন্য জেনারেল এরশাদ কে দীর্ঘ সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় তার ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া প্রায় অর্ধ-যুগের। অর্ধ-যুগ ধরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে, খুব সূক্ষ্মভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে একের পর এক পথের প্রতিবন্ধক বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিয়ে সুকৌশলে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। করতে হয়েছে বিভিন্ন নাটকের অবতারণা।[১৮]

১৯৭৪ সালে লে: কর্নেল হিসাবে এরশাদ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তার কার্যকলাপে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার উপর যথেষ্ট ক্ষিপ্ত ছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান এরশাদ কে অব্যাহতি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন সেনাবাহিনী থেকে। এমতাবস্থায় এরশাদের মামা রিয়াজ-উদ্দিন আহমেদ ভোলা মিয়ার তদবিরে আওয়ামীলীগ সরকার এরশাদ কে পূর্ণ কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। এবং ভারতে থাকাকালীন সময়ে তিনি দূরদর্শিতার সাহায্যে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন।[১৯]

১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন এবং ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পাদ প্রদীপে চলে আসেন তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। এরশাদ গোলমেলে এ সময়ের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেননি। তিনি জিয়াউর রহমান কে ম্যানেজ করে দেশে ফিরে আসেন এবং জ্যেষ্ঠতার দোহায় দিয়ে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে নবম ডিভিশন থেকে ৫৫ পদাতিক ডিভিশনে বদলি করা হয়। ঢাকাসহ ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেডকে সরাসরি সেনাবাহিনীর সদর দফতরের অধীনে ন্যস্ত করাকে কেন্দ্র করে মঞ্জুর এবং শওকত এর মাঝে সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। তৎকালীন চীফ অব জেনারেল স্টাফ মঞ্জুরের এ পদক্ষেপের মাঝে মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী অবিশ্বাস এবং হুমকি দেখতে পান। ধূর্ত এরশাদ জিয়াউর রহমানকে বোঝাতে সক্ষম হন যে এ দুজনই উচ্চাভিলাষী এবং দুজনকেই ঢাকার বাইরে বদলির ব্যাপারে পরামর্শ দেন। জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান এরশাদের কথা বিশ্বাস করেন এবং এ ব্যাপারে জিয়ার অত্যন্ত

বিশ্বস্ত সেনা অফিসার এপিএস মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম ও এরশাদকে সমর্থন করেন। ফলে জেনারেল জিয়া উপরোক্ত পদক্ষেপ নিতে সম্মত হন।[২০]

মঞ্জুর চীফ অব জেনারেল স্টাফ থাকাকালীন একটি বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করতেন। চট্টগ্রামে বদলী হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি মনঃক্ষুন্ন হন। মঞ্জুরের উচ্চাভিলাষের কাহিনী বর্ণনা করে জিয়ার কান ভারী করে তোলার ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দেন এরশাদ। ফলে মঞ্জুর ও জিয়াউর রহমানের মধ্যকার এতদিনের আন্তরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এমনকি এরশাদকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগের পর মঞ্জু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে জিয়াকে তার মনোভাব জানাতে দ্বিধা-বোধ করেননি। এরশাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে মঞ্জুর জিয়াউর রহমানকে অবহিত করেন যে , সেনাবাহিনী প্রধান একজন দুর্নীতিবাজ এবং দুশ্চরিত্র ব্যক্তি।[২১]

তবে বিশ্বস্ততা অর্জনে মঞ্জুর চেয়ে বেশি এগিয়েছিলেন এরশাদ। পরবর্তীকালে শওকত কে ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের কমান্ড থেকে সিইনসি এর সচিবালয়ের পিএস হিসেবে পদস্থ করা হয়। কারণ এরশাদ জিয়াকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, মঞ্জুর ও শওকত ২ জনই যদি ডিভিশনের কমান্ডে থাকে তাহলে তারা অভ্যুত্থান করে ফেলতে পারেন। এভাবে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও শওকতের বিবদমান সম্পর্ক এবং মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তান প্রত্যাগত বিভাজনকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন এরশাদ। পদাধিকার বলে জিয়া এরশাদকে অ-মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব দেন আর এ বাহ্যিক ছদ্মবেশের রূপ ধরে জিয়ার সঙ্গে এ মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল-দ্বয়ের সম্পর্কের অবনতির সুযোগ নেন এরশাদ। ইতিমধ্যে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দল বিএনপিতে কোন্দল দেখা দেয়। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঐ সংকট নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য চট্টগ্রামে গমন করেন।[২২]

উল্লেখ্য এরশাদ মঞ্জুরের সঙ্গে গোপন আলোচনার জন্য জিয়া হত্যার মাত্র ৪ দিন আগে ১৯৮১ সালে ২৬ মে এক অঘোষিত সফরে চট্টগ্রামে যান। সেনাবাহিনীর সদর দফতর থেকে জানানো হয় এরশাদ বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী পরিদর্শনে যাচ্ছেন কিন্তু জানা যায় এরশাদ চট্টগ্রামে পৌঁছেই মঞ্জুরের অফিস কক্ষে ঢুকেন এবং দুপুর ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরামহীন আলাপ করেন। তিনি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী পরিদর্শন না করে সারাদিন মঞ্জুরের সাথে এত কি আলোচনা করেছিলেন তা আজো রহস্যাবৃত। বিকাল ৫টায় এরশাদ মঞ্জুরের সাথে আলোচনা শেষ করে বিমান বন্দরের দিকে যাত্রা করেন। মঞ্জুর এরশাদকে দুর্নীতিবাজ হিসাবে ঘৃণার চোখে দেখতেন বলে কোনও সময়ই তাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা বা বিদায় জানাতে যাননি। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, মঞ্জুর এবারই প্রথম এরশাদ কে বিদায় জানাতে একই স্টাফ কারে বসে বিমানবন্দরে গেলেন। ২৯ মে (১৯৮১) জিয়া তার দলের দুই বিবদমান গ্রুপের সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে পূর্ব নির্ধারিত রাজশাহী যাত্রা বাতিল করে চট্টগ্রামে যান। উল্লেখ্য, জেনারেল এরশাদের ও প্রেসিডেন্ট জিয়ার সহযাত্রী হবার কথা ছিল। বস্তত এরশাদের জন্য জিয়া বিমানবন্দরে প্রায় ৩০ মিনিট অপেক্ষা করেন। পরে এরশাদ বিনীতভাবে ফোনে রাষ্ট্রপতিকে জানান তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়েছেন, তাই তিনি আগামীকাল সকালে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতির সাথে মিলিত হবেন। জানা যায় জিয়া যখন বিমানে চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন তখন এরশাদ মঞ্জুরকে জানান, মঞ্জুর বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানাবেন

তা রাষ্ট্রপতি চায় না। নানা ক্ষোভে বেসামাল মঞ্জুর ভয়ানক ক্ষুব্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের সাথে কথা বলেন। সামরিক সচিব বলেন, রাষ্ট্রপতি যখন অনিচ্ছুক তখন তার বিমানবন্দরে না যাওয়াই উচিত। মঞ্জুর এতে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন। এরশাদ কৌশলে এ ধরনের একটি মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন এবং জিয়া ও মঞ্জুরকে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সংঘাতের মুখে ঠেলে দিলেন। আর এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি জিয়া ২৯ মে ১৯৮১ চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে সার্কিট হাউসে অবস্থানকালে ৩০ মে ১৯৮১ সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী কিছু সৈন্যের হাতে নির্মম ভাবে নিহত হন।[২৩]

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানরা আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং রাষ্ট্রপতি সাত্তার ও ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ পূর্ণ সহযোগিতা করেন। [১৯]

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরপরই এরশাদ সামরিক আইন জারি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু সামরিক অফিসার এবং বিমানবাহিনী প্রধান সদরুদ্দিনের বিরোধিতার কারণে এরশাদ তা করেননি বা বিলম্ব করেন। [২৪]

ক্ষমতা দখলের জন্য এরশাদের এ প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষ জানতেন না। বরং তারা জানলেন জিয়া হত্যার পর এরশাদ ক্ষমতা দখল করতে পারতেন কিন্তু করেননি বরং সাত্তার সরকারকে কাজে সহায়তা করেছেন, শুধু তাই নয়, এরশাদ যে আইন শৃঙ্খলা এবং জিয়াউর রহমানের ভক্ত তা প্রমাণের জন্য জিয়াউর রহমানের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করলেন এবং জিয়া হত্যার সাথে জড়িত করে বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে ফাঁসি দিলেন। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নীকে ক্যান্টনমেন্টের দামী জায়গায় বাড়ীর মালিকানা দেয়া হয়। সেসময় প্রেসিডেন্টকে দিয়ে সেনাবাহিনীর সুযোগ সুবিধা এত বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি করা হল, যে সিভিল সমাজে সেনাবাহিনী পরিচিত হয়ে উঠলো লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে। জিয়ার মৃত্যুর পর সেনাবাহিনীতে এরশাদ হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা। [২৫]

সবকিছুর নেপথ্য চলতে থাকে ক্ষমতা-লোভী এরশাদের সামরিক আইন জারির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্রথমেই তিনি ২টি কাজ সম্পন্ন করলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সাহায্যে সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করলেন। ১৯৮১ সালের ১১ নভেম্বর এক সঙ্গে ১৯ জন মেধাবী অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হল। এরপর হুমকি দিয়ে শতাধিক অফিসার কে পদত্যাগে বাধ্য করা হল। আর এভাবে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটা সেনাবাহিনী পাকিস্তান প্রত্যাগতদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেল। দ্বিতীয়ত, সেনাবাহিনী অফিসার ও সৈনিকদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংবলিত সুপারিশ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন লাভ করলো। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর বিচারপতি সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। আর ২৯ নভেম্বর সেনাবাহিনীর সব নিয়মনীতি ভঙ্গ করে এরশাদ সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে একটি সংবাদ করলেন। সাংবাদিকদের সামনে এরশাদ বিস্তারিত ভাবে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে তিনি একজন সৈনিক, রাজনীতিবিদ নন এবং তার কোন ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ নেই। সামরিক লোকজন

রাজনীতিতে সামরিক এডভেঞ্চার কামনা করেনা। তারা কেবল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় জনগণকে সাহায্য করতে এবং যে কোন ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়।[২৬]

মাত্র ৫ মাসের মাথায় এরশাদ তার বক্তব্য পালটে ফেলেছিলেন। এরশাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা শানিত ছিল তার ক্ষমতা দখলের পূর্ব থেকেই। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের আবরনের ছত্রছায়ায় আকর্ষণীয় করে তোলেন। **১৯৮১** সালের জানুয়ারিতে Bangladesh Army Journal পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে জেনারেল এরশাদ বলেন। আমার সুস্পষ্ট দাবি জাতীয় বাহিনী হিসেবে জাতির সমষ্টিগত উদ্যোগে সামরিক বাহিনীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকা উচিত। [২৭]

জেনারেল এরশাদ সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা যুদ্ধে ও জাতী গঠনে সামরিক বাহিনীর অবদান উল্লেখপূর্বক রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাদের অংশগ্রহণের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করেন। **১৯৮১** সালের আগস্ট মাসে 'Peter Nies Ward' এর সাথে সাক্ষাতকারে জেনারেল এরশাদ বলেন ' The army should be directly associated with the governance of the country which might fulfill the ambitions of the army and might not lead to further coups'[২৮]

১৯৮১ সালের নভেম্বরে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে এরশাদ বলেন, 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য সামরিক বাহিনীকে শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান অনুমোদিত একটা ভূমিকা দিতে হবে। [২৯]

রাষ্ট্রপতি সাত্তার চাপের মুখে সেনা প্রধানের দাবী মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। জেনারেল এরশাদ যুক্তি উপস্থাপন করেন সরকার পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ জরুরী এই কারণে যে, তাহলে সৈনিকরা এদেশ গঠনে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ থাকবে এবং ফল স্বরূপ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চাইবেনা। [৩০]

এমন সময় অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী জেনারেল এরশাদের সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায় অংশগ্রহণের দাবী প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি প্রদান করলে অপর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন এরশাদের যুক্তি সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু প্রায় সব রাজনৈতিক দল এরশাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি মহলে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সে সময় সিভিল সমাজের পক্ষে বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হন শেখ হাসিনা ও সুপ্রিম কোর্টের **১৫৫** জন এডভোকেট। তারা বিবৃতিতে বলেন সরকার অথবা সেনাবাহিনীর অপর কোনও বিবৃতি প্রদান অথবা সংবাদ সম্মেলন করার এখতিয়ার নেই। বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাতকার শেখ হাসিনা বলেন। **১৯৭৫** সালের **১৫** আগস্ট হতে আজ অবধি ক্ষমতা দখলের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই সেনাবাহিনীর এখন তাই ক্ষমতা ভাগাভাগির দাবী খুবই স্বাভাবিক। রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রবেশ কাম্য গণতান্ত্রিক দেশের জন্য কাম্য নয়, হতে পারেনা।[৩১]

এমতাবস্থায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের দৃস্টি আকৃষ্ট হলে তিনি বলেন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ছাড়া সামরিক বাহিনীর অন্য কোন ভূমিকা থাকতে পারেনা। এতেও এরশাদ নিরস্ত হননি। বিদেশি পত্রপত্রিকায় প্রদত্ত

বিবৃতির ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য জাতীয় পত্রপত্রিকায় বিশেষ করে অবজারভার এবং হলিডে কে বলেন আমাদের অত্যন্ত উঁচুমানের সেনা বাহিনীকে দেশরক্ষা ছাড়াও উৎপাদন ও জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে ব্যবহার করা যেতে পারে।[৩২]

শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা সম্পর্কে এরশাদের বক্তব্য বিবৃতিতে তার ২টি সুবিধা হয়। যা বলার তা তো তিনি বললেন সঙ্গে সঙ্গে এমন ধারনা ও দিলেন, এই বক্তব্য তার একার নয়, এ ব্যাপারে সমগ্র সামরিক বাহিনী তার সঙ্গে রয়েছে। [৩৩]

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু তার সব সময়ই ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই থেকে-প্রকাশিত 'GULF News' প্রতিকায় পাকিস্তানী সাংবাদিক মুসাহিদ হুসেনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এরশাদ বলেন " বহু দিন পূর্বে যখন জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যু হয় তখন আমি ধৈর্য ধরেছি, আমি ক্ষমতা দখল করিনি। সংবিধান অনুযায়ী আমি উপরাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ দেই। তখন উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন হাসপাতালে। [৩৪]

চতুর্থ সংশোধনী আইনের পর রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। অসামান্য দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও ক্ষমতা প্রয়োগে পারদর্শী এবং প্রাজ্ঞ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল সে পদের জন্য। কিন্তু বয়স স্বাস্থ্য ও পেশাগত অভিজ্ঞতাহীনতার কারণে বিচারপতি সাত্তার কোনদিন সে পদে উপযোগী ছিলেন না একেবারেই। বারে বারে হোঁচট খেয়েছেন, বাহ্যিক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য তিনি তাকিয়েছেন এদিক ওদিক। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এরশাদ ও তার সহযোগীরা সেটা বুঝে ক্ষমতার সকল দরজার দিকে এরশাদ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। বিচারপতি সাত্তারকে সামনে রেখেই তারা ক্ষমতা দখলের সুনিপুণ ক্ষেত্র রচনা করেন। সংবিধান অনুযায়ী একশ আশি দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হয় এবং সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল **১৯৮১** সালের **১৫**ই নভেম্বর। ঐ নির্বাচনে এরশাদ এবং তার সহযোগীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কোন প্রার্থী তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য তা তারা খোলাখুলি বলেন , নির্বাচনী প্রচারণায় বিচারপতি সাত্তার নিজের সম্পর্কে বলেন, 'প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আস্থা-ভাজন দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে শ্রদ্ধেয় আমি। [৩৫]

নির্বাচনের ৫ সপ্তাহ পূর্বে এরশাদ বুঝতে পারলেন নির্বাচনে ডঃ কামাল হোসেনের অবস্থা তুলনামূলক ভালো। তাই কোনো প্রকার ঝুঁকি নিতে তিনি রাজি হননি। সামরিক বাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব দেয়ার মতো ঔদ্ধত্য দেখান। ভাষণে উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেন এ মুহূর্তেই তিনি বঙ্গভবন ছেড়ে চলে যাবেন।[৩৬]

এরশাদ এরপর আর এগুতে সাহস পাননি, তবে নির্বাচনের পরে এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে শান্তিতে থাকতে দেননি, মাত্র ৪ মাসে তাকে সামলাতে হয়েছে প্রায় ৪ হাজার ফ্রন্ট। [৩৭]

এরশাদ, সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার বিষয়টি একটি রাষ্ট্রপতি কমিটির দ্বারা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। এ অবস্থায় সাত্তার এরশাদের দাবির সাথে তার নীতিমালার সমন্বয় সাধনে একমত হন। রাষ্ট্রপতি থাকা নিরাপদ মনে করছিলেন না। এমতাবস্থায় একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্রপতি সাত্তার জেনারেলদের সঙ্গে

আলোচনা শুরু করেন এবং ফল হিসাবে ১০ সদস্য বিশিষ্ট জাতিয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় (১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি) ৩ বাহিনী প্রধান প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে বললেন, তারা এ পরিষদে যোগ দেবেনা কারণ সেখানে সিভিলিয়ান মন্ত্রীদের সংখ্যা বেশি। এটা ছিল সিভিল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। প্রেসিডেন্ট সাত্তার দাবি মেনে নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যা কমিয়ে ৬ জন করেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ মন্ত্রীসভার চেয়ে শক্তিশালী কোন সংস্থার ভূমিকা নিতে পারবে এ আশঙ্কায় অনেকেই সন্দিহান হয়ে পড়ে।

আওয়ামীলীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা (অব:) শওকত আলী সংসদ অধিবেশনে অভিযোগ করেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল একটি SUPER GOVERNMENT হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে অর্থাৎ সরকারের খাড়া করে দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে আলোচিত হয়নি। সেজন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। [৩৮]

এ সময় জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিপ্রায়ের নিন্দা করেন। এরশাদ সেনাবাহিনীর আইন কানুন ও শৃঙ্খলাকে দারুণভাবে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক নেতার মতো বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। তেজগাঁও কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এবং মুক্তিযোদ্ধা সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অপর এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দানকালে দেশের প্রশাসনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা দাবী করে রাজনৈতিক বক্তৃতা রাখেন।[৩৯]

এরশাদের এসব কর্মতৎপরতায় রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এরশাদ সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সাত্তার সরকার কে উৎখাত করবেন। [৪০]

এ সঙ্কটের নিরসন এ ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রের ধারা রক্ষার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। মেজর জেনারেল শামসুজ্জামান কে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যায়। তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরীকে টেলিভিশন ও বেতারে সংবাদ পরিবেশন করার নির্দেশ দেন এবং মেজর জেনারেল শামসুজ্জামান কে নতুন নিয়োগের কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী জাতীয় সম্প্রচারের পরিবর্তে এরশাদকে অবহিত করেন। ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার কথা ছিল ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ । তার পরিবর্তে ২৪ মার্চ এসেছিল বিচারপতি সাত্তারের পদত্যাগের খবর। [৪১]

৩.৫ উপসংহার

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকেই এরশাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন, আর তাই সুযোগ বুঝে নানা কারণ উপস্থাপন করে ক্ষমতা দখল করেন। এরশাদের ক্ষমতা দখলের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যে, ইতিপুর্বে বাংলাদেশে যে সব অভ্যুত্থান ঘটেছে সেগুলোর মত হঠাৎ করে গজিয়ে উঠা নয়, বরং এটি সুপরিকল্পিত এবং ঠাণ্ডা মাথায় লাভ-লোকসানের মুল্যায়ন করেই এর পরিকল্পনা করা হয়। তাছাড়া এ অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিনী প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ যতটুকু জড়িত ছিল তার থেকে কয়েকগুন বেশি ছিল ব্যক্তি জেনারেল এরশাদের উচ্চাভিলাষ। ফলশ্রুতিতে সদ্য স্বাধীন দেশটি গণতন্ত্রের পথ থেকে পুণরায় সামরিক শাসনের নিগড়ে পুনরায় আটকে পড়ে এরশাদের হাত ধরে।

পাদটীকাঃ

১) মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃআজিজিয়া বুক ডিপো, এপ্রিল ২০০১, পৃ: ৪৮১।

২) মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৮২-৯০, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, আগষ্ট ১৯৯১, পৃ:৭।

৩) ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদশে রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকাঃনিউ এজ পাবলকিশেন্স,পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮।

৪) আমীর খসরু, রাজনীতির সামরিকীকরণ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের রাজনীতির ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃবইমেলা ১৯৯১, পৃ: ১৭-১৮।

৫) অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশে সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ:৩৯।

৬) অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি:, ১৯৬৪, পৃ: ৪৭০।

৭) অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি:,১৯৬৪, পৃ: ৪৭২।

৮) রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫।

৯) অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫।

১০) অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২২।

১১) অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ: -৪৭।

১২) Martial Law Proclamation Order Registered No D A I. The Bangladesh Gazette Extraordinary Published by Authorty, Wednesday, March 24, 1982.

১৩) সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাদিত) গণআন্দোলন ১৯৮২-৯০, ঢাকা:, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫-০৩-১৯৮২, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯১, পৃ:১২।

১৪) নুরুল ইসলাম (বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি) এর ভাষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠান, ১৬ মার্চ ১৯৮২।

১৫) সাক্ষাৎকার গ্রহণ: বদরুদ্দোজা চৌধুরী,২১ সপ্টেম্বের ১৯৯৪।

১৬) সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মোহাম্মদ হানিফ ৬ অক্টোবর ১৯৯৪।

১৭) হারুন-অর- রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স,পৃঃ ৩৫৮।

১৮) এলাহি নেওয়াজ খান সম্পাদনায়, এরশাদের উত্থান পতন, ঢাকাঃ ওয়েসিস বুকস, ১৯৯১, পৃঃ ৪ ।

১৯) মেজররফিকুল ইসলাম, স্বৈরশাসনের ৯ বছর, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯১, পৃঃ ৩৬।

২০) রুহুল আমিন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারার নেতৃত্ব, ঢাকাঃহিরা বুক মার্ট, ১৯৯৩, পৃঃ ১০।

২১) মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, স্বৈরশাসনের ৯ বছর ১৯৮২ থেকে ৯০, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১, পৃঃ ৩৪-৩৭।

২২) রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

২৩) পিটার নেসওয়াল্ডের সঙ্গে জেনারেল এরশাদেরসাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য: দি হোলি ডে ১৮ অক্টোবর ১৯৮১।

২৪) মেজর রফিকুল ইসলাম ,প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৭।

২৫) ফয়েজউদ্দিন আহম্মেদ, ৫ শতকের স্মৃতিকথা, ঢাকাঃ পরমা প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃঃ ৯।

২৬) মউদুদ আহম্মেদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১ অক্টোবর, ১৯৯৪।

২৭) এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, প্রকাশক শেখ মুহম্মদ ইসমাইল হোসেন, ঢাকা, ১৯৯১।

২৮) The International Herald Tribune, 27 August 1981.

২৯) এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

৩০) The Guardian (London), 7 October 1981.

৩১) ইউসুফ মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৩২) D. Sen, 'Bangla Army Chief Issues on pole in Government' The Hindustan Times, 22 November 1981.

৩৩) এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭-৫৮।

৩৪) এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।

৩৫) এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ -৫৮-৫৯।

৩৬) এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ -৫৯।

৩৭) এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ -৬০।

৩৮) তৎকালীন সংসদ অধিবেশনের কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য, ঢাকাঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪-০১-১৯৯২।

৩৯) লন্ডন থেকে প্রকাশিত দি গার্ডিয়ান, ৭ অক্টোবর ১৯৮১ ও নিউইয়র্ক টাইমস, ১৪ অক্টোবর ১৯৮১ সংখ্যায় এরশাদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়।

৪০) সাক্ষাতকার বদরুদ্দোজা চৌধুরী (জাতীয় সংসদের উপনেতা) ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

৪১) মেজর রফিকুল ইসলাম ,প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

চতুর্থ অধ্যায়

এরশাদের ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডঃ

৪.১ সুচনাঃ

লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সেনাবাহিনী প্রধান থাকা কালে সমগ্র সামরিক বাহিনীর ব্যবহার করে অস্ত্রের জোরে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এরশাদ সামরিক বাহিনীর সুনাম ক্ষুন্ন করে তাঁর উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। রাষ্ট্রের পবিত্র দলিল সংবিধান স্থগিত, নির্বাচিত সংসদ বাতিল, জনগনের আইনানুগ অধিকারে বাধা সৃষ্টিকারী আদেশ নির্দেশ ঘোষণা এবং সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেআইনী আদেশ নির্দেশ প্রদান করে ও ভয় ভীতি দেখিয়ে তিনি সামরিক শাসন কার্যকর করেন।

এরশাদ বিভিন্ন নির্বাচনে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তার পূর্বক ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ভোটের ফলাফল নিজ অনুকূলে প্রচারমাধ্যমে ঘোষণার ব্যবস্থা করেন। তিনি অবৈধভাবে উপার্জিত কোটি কোটি টাকা বিদেশ পাচার করেছেন এই মর্মে ১৯৮৬ সালে লন্ডন অবজারভার এবং ১৯৮৯ সালে ওয়াশিংটন টাইমস পত্রিকায় পৃথক পৃথক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি দুইশত মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলা থেকে পাচার করেছেন। এছাড়া ও নানাবিধ দুর্নীতি, গুরুতর অনিয়ম দেশের অর্থনীতি ধ্বংস ও অন্যান্য অপরাধমূলক র্কমকান্ড তদন্তাধীন রয়েছে।[১]

১৯৮২ সালের এরশাদের ক্ষমতা দখল থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এরশাদের ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত কোন কর্মকান্ডকেই বৈধতার সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এরশাদ সরকারের ক্ষমতায় আরোহণ যেমন অবৈধ তেমনি দুর্নীতিতে পুর্ন ছিল। অবৈধ সরকার গণসমর্থন থেকে স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চিত হয়। সুতরাং জনসমর্থন ও সম্পৃক্ততাহীন সরকার জনকল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বস্ততার সাথে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এরশাদের পূর্ণ কর্মকাল পর্যবেক্ষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উন্নয়ন ও কল্যাণ শুধুমাত্র মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুধুমাত্র তার মোসাহেব, অনুগ্রহধন্য অনুগত অনুচরদেরই বিপুলভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছিল। আর সাধারণ মানুষের উন্নতি অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে অধিকার পদদলিত ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং বৈধতার সংকটে জর্জরিত এরশাদ সরকারের আমলে উন্নয়নের গতিশীলতার পথ রুদ্ধ হয়ে পশ্চাৎপদ অর্থনীতির দিকে ধাবিত হয়েছিল সমগ্র সমাজ। আভ্যন্তরীণ ও আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে কোথাও এ সরকারের সমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতা ছিলনা। তথাপি শক্তি প্রয়োগ ও দমননীতি চালিয়ে দীর্ঘ নয় বৎসর ক্ষমতাসীন থেকেছে এরশাদ সরকার এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চরম ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা জাতীয় সম্পদ অবাধে লুটপাট করে সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে।[২]

৪.২ এরশাদের ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

প্রাথমিক কর্মকান্ডঃ

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেন। এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেই আইনশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির মূলোৎপাটনের প্রতিশ্রুতি দেন। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর পূর্বের সামরিক শাসকদের মতো অঙ্গীকার করেন যে, তিনি কখনই রাজনীতিতে জড়াবেন না, নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন দুর্নীতির মূলোৎপাটনের, অর্থনৈতিক উত্তরণ, প্রশাসনিক দক্ষতা বিধি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার। সামরিক শাসন জারির অব্যবহিত পরেই লে: জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে তিনি কতিপয় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্ত গুলো ছিল নিম্নরূপ;

- সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
- জাতীয় সংসদ কে ভেঙ্গে দেয়া হয়।
- মন্ত্রীসভা বাতিল করা হয়।
- সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়।
- স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।
- রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দায়িত্ব করবেন এবং তার কাজে সাহায্য করার জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করেন ।
- সময়ে সময়ে জারিকৃত সামরিক বিধির সাহায্যে দেশ শাসন করা হবে।[৩]

এরপর নয় বছর পেরিয়ে গেছে ৫টি লক্ষ্যের কোনোটিই অর্জিত হয়নি।[৪]

অবশ্য ওই ঘোষণা অনুযায়ী জেনারেল এরশাদ সরকার ও শাসন ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান ও বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদকে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। জেনারেল এরশাদ সমগ্র দেশকে ৫টি সামরিক আইন অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং ৫ জন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের উপর ন্যস্ত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশাসন কে আরও দক্ষ ও নিপুণ করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। প্রথমে উপদেষ্টারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ১২ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। পরে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ জনে উন্নীত হয়।

এরশাদ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়কার রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এরশাদ এরশাদ ক্ষমতায় এসে প্রথমে চেষ্টা করেন রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের । কারণ তিনি ক্ষমতায় এসে বলেন, দেশের সংকটময় সময়ে এসেছেন এবং দেশের এই সংকটময় অবস্থা দূর করে একটি স্থিতিশীলতা এনে

ক্ষমতা থেকে বিদায় নিবেন। আসলে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রাখা। এ কারণে তিনি কিছু কাজ যেমন রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরুর অনুমতি, ১৮ দফা কর্মসূচী, স্থানীয় সংস্থার ক্ষমতা নির্বাচন, গণভোট, উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠান, জাতীয় নির্বাচন, সংবিধানের কিছু সংশোধনী করেন । তার আরও উদ্দেশ্য ছিল সামরিকীকরণ করা। তিনি প্রশাসনে সামরিকীকরণ করেন এবং প্রচার মাধ্যম ক্ষমতায় নাম ও অবস্থার দলীয়করণ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বংস সাধন, বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে যাবতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করা ও দূর্নীতি করা।

এ কারনে এরশাদ সরকার জনগনের সমর্থন আদায়ের জন্য কতিপয় প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেন যা ছিল নিম্নরূপঃ

- দেশকে সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা।
- সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কবল থেকে সমাজ মুক্ত করা।
- সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের ধ্যান ধারনার কার্যকর প্রতিফলন ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।
- সুখী ও সমৃদ্ধ শীল এবং শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।
- একটি কর্মক্ষম ও সংবেদনশীল প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা যা জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে।
- ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে আপামর জনসমষ্টির ভাগ্যোন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।
- একটি সর্বজন গ্রাহ্য রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে অসৎ রাজনীতির শিকার হতে পরিত্রাণ দেয়া।
- বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ ও দ্রুত বিচার কার্য সম্পাদন ।
- আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন।

প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করার পর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জনগণের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে জিয়াউর রহমানের অনুকরণে তার সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ দফাগুলো নিম্নরূপঃ

- অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল লাভ করা।
- ধনী ও দারিদ্র্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে জাতীয় সম্পদের সমবন্টন করা।
- গ্রামীণ উন্নয়ন সাধন করা।
- উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্যের যথার্থ বণ্টন ও প্রতিযোগিতা সৃষ্ঠি করা।
- কৃষি পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন।
- কৃষকদের ন্যায্য পাওনার নিশ্চয়তা ও তাদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা বিধান পূর্বক ভূমি সংস্কার সাধন।
- পল্লী এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষের পুঁজি বিতরণ ও সরবরাহ করা।
- বেসরকারি খাতের শিল্পগুলোকে উৎসাহদান ও বিনিয়োগের পরিবেশ সৃস্টি করা।
- সমবায় ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন।
- প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে পুনর্বিন্যাস এবং বিকেন্দ্রীকরণ ও কৃচ্ছতা সাধন করা।
- সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা।

- জাতীয় উন্নয়ন তৎপরতার অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলারা যাতে সমাজে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্য করা।
- জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুবিধা প্রদান।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।
- রাজনীতিকে কাজের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করতে এবং জাতীয় জীবনে ইসলামি মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজেদের ভাষা কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও অধিকারকে সমুন্নত রাখা।[৫]

জেনারেল এরশাদ **১৯৮৩** সালের **১৭** মার্চ কুমিল্লা স্টেডিয়ামে স্থানীয় সরকার ও সমবায় প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকারে বলেন জনগণের **১৮** দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো। এরপর দেশবাসী আশা করেছিল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে, দুর্নীতির মূলোৎপাটন ঘটবে এবং দেশে অর্থনৈতিক সংকটের অবসান হবে। কিন্তু সামরিক শাসন জারির অল্প দিনের মধ্যে সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। আর্থ রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও সামাজিক অঙ্গনে যে বিপ্লবী সংস্কার, দেশ গড়ার উদ্যোগ, ঔপনিবেশিক জরাজীর্ণ ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের মহান প্রয়াস বলে অভিহিত করা হয়।[৬]

মূলত দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ সামরিক শাসকের ন্যায় জেনারেল এরশাদ তার সামরিক শাসনকে উন্নয়ন ও জনমুখি হিসেবে পরিচিত করার প্রয়াস চালান। এ দৃষ্টিভঙ্গির অংশস্বরূপ তিনি জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর, প্রশাসনের ব্যয় হ্রাস এবং দুর্নীতি দমন এসব কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরপর শুরু করেন সমর্থনের ভিত্তি ও রাজনৈতিক আদর্শ গঠনের প্রচেষ্টা।[৭]

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় থাকার জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা তিনি করেননি। ক্ষমতা হারানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছিলেন।[৮]

৪.৩ জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রচেষ্টা ও বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়াঃ

জেনারেল এরশাদ নিজ শাসনকে বেসামরিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে তার পূর্বসূরি জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে সকল সামরিক শাসকের মডেল প্রায় অভিন্ন। এরশাদ অনুসৃত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ

রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরুর অনুমতিঃ

বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জেনারেল এরশাদ **১৯৮৩** সালের **১** এপ্রিল থেকে 'ঘরোয়া রাজনীতি' এবং **১৪** নভেম্বর থেকে 'প্রকাশ্য রাজনীতি'চর্চার অনুমতি প্রদান করেন**।** কিন্তু কয়েক দফায় তাকে এরূপ রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দিয়ে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করতে হয়।

১৮ দফা কর্মসুচিঃ **১৯৮৩** সালের **১৭** মার্চ জেনারেল এরশাদ **১৮** দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যা ছিল জিয়ার **১৯** দফা কর্মসূচির অনুরূপ। তার **১৮** দফা কর্মসুচিগুলো ছিল নিন্মরুপঃ

1. অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল ভাল করা।
2. ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে জাতীয় সম্পদের সমবণ্টন করা।
3. গ্রামীণ উন্নয়ন সাধন করা।
4. উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্যের যথার্থ বণ্টন ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি।
5. কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
6. কৃষকদের ন্যায্য পাওনার নিশ্চয়তা ও তাদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা বিধান পূর্বক ভূমির সংস্কার সাধন**।**
7. পল্লী এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে পুঁজি গঠন ও সরবরাহ করা।
8. বেসরকারী খাতের শিল্পসমূহকে উৎসাহ দান ও বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা।
9. সমবায় ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন।
10. প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে পুনর্বিন্যাস এবং বিকেন্দ্রীকরণ ও কৃষ্ণতা সাধন করা।
11. ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা বিধানপূর্বক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।
12. সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা।
13. জাতীয় উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলারা যাতে সমাজে নিজেদেরন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করা।
14. জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
15. জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ করা।
16. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ করা।
17. রাজনীতিকে কাজের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করা।
18. জাতীয় জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটান এবং নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে সমুন্নত রাখা।

জিয়াউর রহমানের ১৯ দফাঃ

জিয়া সরকার তার শাসনকে বৈধ করার লক্ষ্যে দেশে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। **১৯৭৭** সালের ৩০শে মে গণভোট অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয়। ইতঃপূর্বে ২২শে এপ্রিল (১৯৭৭) রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান **১৯** দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দফাগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

1. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।
2. সংবিধানের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলন করা।
3. সর্ব উপায়ে নিজেদের একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।
4. প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
5. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতি কে জোরদার করা।
6. দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভূখা না থাকে তার ব্যবস্থা করা।
7. দেশে কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সকলের জন্য অন্তত মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।
8. কোন নাগরিক যেন গৃহহীণ না থাকে তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।
9. দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
10. সকল দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।
11. সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুব সমাজকে সুসংহত করে জাতিগঠনে উদ্বুদ্ধ করা।
12. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান।
13. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।
14. সরকারী চাকুরীজীবীদের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
15. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।
16. সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।
17. প্রশাসন ও উন্নয়নব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।
18. দুর্নীতি মুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।
19. ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিক অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।[৯]

এরশাদের ১৮ দফা ও জিয়াউর রহমানের ১৯ দফার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য সমূহঃ

- দুজনই দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা রক্ষা করার কথা বলেছেন।
- কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের কথা বলেছেন
- সকলের জন্য যথাসম্ভব চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়া।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।
- শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা এবং সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান করা।
- প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ।
- সমাজে নারীদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।
- জাতীয় জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো।[৭]

এরশাদের ১৮ দফা ও জিয়ার ১৯ দফার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সমূহ:

- এরশাদ ধনী ও দারিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে জাতীয় সম্পদের সমবন্টনের কথা বলেছেন।
- জিয়াউর রহমান জাতীয় সম্পদের সমবন্টনের কথা বলেননি।
- এরশাদ গ্রামীণ উন্নয়ন সাধন করার কথা বলেছেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান গ্রামীণ উন্নয়নের কথা বলেননি।
- এরশাদ সমবায় ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের কথা বলেছেন। জিয়াউর রহমান তা বলেননি।
- জিয়াউর রহমান কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এরশাদ এমন কোন দফার কথা বলেননি।
- জিয়াউর রহমান সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এরশাদ এমন কোন দফার কথা বলেননি।
- জিয়াউর রহমান নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এরশাদ এমন কোন কথা বলেননি।

স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনঃ

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর দেশের ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সকল পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গণভোটঃ

বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে এরশাদের অধিষ্ঠিত থাকা এবং তার অনুসৃত নীতিমালা ও কর্মসূচির প্রতি জনগণের আস্থা বা সমর্থন আছে কি নাই তা ভোটারদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, গণভোটে এরশাদের পক্ষে শতকরা ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট পড়ে।

ফলাফল যাই দেখানো হোক না কেন এতে যে খুবই স্বল্প সংখ্যক ভোটার অংশগ্রহণ করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানঃ

এরশাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিরোধী দলের বয়কট ও প্রতিরোধের কারণে ঐ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরে ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে এ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে এরশাদ উপজেলা পর্যায়ে একটি ক্ষমতার ভীত গড়ে তোলার সুযোগ পান।

দল গঠনঃ

বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে রাজনৈতিক দল গঠন। এ লক্ষ্যে প্রথমে এরশাদের এক মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিষদ নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। একই বছর ২৭ নভেম্বর এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রপতি আইজুদ্দিনকে চেয়ারম্যান করে জনদল নামে একটি দলের নাম ঘোষণা করা হয়। ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিষদ এবং অন্যান্য দলের ক্ষুদ্র কিছু অংশ বা দলছুট ব্যক্তি এতে শামিল হয়। এরূপ ১৯৮৫ সালের ১৬ আগস্ট জনদলের সঙ্গে আরও ৪টি ক্ষুদ্র দল কাজী জাফরের ইউ,পি,পি সিরাজুল হোসেন খানের গণতান্ত্রিক পার্টি, বি, এ সিদ্দিকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একটি অংশ এবং শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির একটি অংশ মিলিত হয়ে জাতীয় ফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠন করে। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এদের একি দলে একীভূত হওয়ার মাধ্যমে জাতীয় পার্টি গঠিত হয়। এরশাদ আরও পরে (১৯৮৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর) এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন।

জাতীয় নির্বাচনঃ

১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন তিন দফা তারিখ পরিবর্তনের (২৭ মে ১৯৮৪, ৬ এপ্রিল ১৯৮৫, ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬) পর অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লিগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, জাসদ, মুসলিম লীগ, ওয়ার্কাসপার্টিসহ মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে।[৮]

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলঃ

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট(প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪
আওয়ামীলীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৫
বি,এন,পি	১০	৫	১.২৯

কমিউনিস্ট পার্টি	৯	৫	০.৯১
বাকশাল	৬	৩	০.৬৭
জাসদ(সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭
ওয়ার্কাস পার্টি	৪	৩	০.৫৩
ন্যাপ(মোজাফফর)	১০	২	০.৭১
গণ আজাদিলীগ	১	-	০.০৮৮
৮ দলীয় জোট	-	৩১০	৯৭
জামাত-ই- ইসলামী	৭৬	১০	৪.৬০
জাসদ (রব)	১৩৮	৪	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১০৩	৪	১.৪৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৬০০	৩২	১৭.৮৬
মোট	১৫২৭	৩০০	১০০

জাতীয় পার্টি মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩ ও শতকরা ৪২.৩৪ ভাগ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। আওয়ামীলীগ একক ভাবে ৭৬ টি আসন ও শতকরা ২৬.১৫ ভাগ ভোট লাভ করে সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট সর্বমোট ৯৭টি আসন এবং শতকরা ৩১.২১ ভাগ ভোট পায়। নির্বাচনে জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আওয়ামীলীগ ও জোটের প্রার্থীদেরই জয়ী করেছিল, এরশাদ সরকার মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে সে বিজয় ছিনিয়ে নেয়। পর্যবেক্ষকদের মতে এ দাবীর যথার্থতা রয়েছে।[৯]

১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনঃ

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ অবৈধভাবে যে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয় তা বৈধ করার অপচেষ্টায় এ নির্বাচন। [১০] দেশের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৫ অক্টোবর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। জাতীয়তাবাদী দলের মতো আওয়ামীলীগ সাত দল এবং অধিকাংশ বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে। মাত্র ২টি দলের প্রতিনিধি এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এরা হলেন জাতীয় পার্টির হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, খেলাফত আন্দোলনের আমীর মাওলানা মোহাম্মদউল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর। জাসদ রব প্রকাশ্যভাবে এরশাদকে সমর্থন করেন। দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটানোর পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা লে: কর্নেল(অব:)সৈয়দ ফারুক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রায় সবাইকে হতবাক করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন এ নির্বাচনে এরশাদ সহ ১২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যারা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছেন তাদের নাম ও প্রতীক নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত তালিকা অনুসারে প্রদত্ত হল:

অলিউল ইসলাম (সুক্কুমিয়া): কুঁড়েঘর, আলহাজ্ব মেজর (অব) মোঃ আনসারউদ্দিন : তলোয়ার, মুহাম্মদ আনসার আলী : পাগড়ি, মোহাম্মদউল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর : বটগাছ, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান মজুমদার : গোলাপ ফুল। মোহাম্মদ আব্দুসসামাদ : দাঁড়িপাল্লা, মোহাম্মদ জহিরখান : নৌকা, লে: কর্নেল(অব:) মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী: ছাতা, আল-হাজ্ব মাওলানা খায়রুল ইসলাম: খেজুর গাছ, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ : লাঙল।[১১]

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো যেমনঃ ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধিতা করায় এরশাদের সামরিক সরকার নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৮৩ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে এরশাদ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়। ২০ অক্টোবর সরকারী ভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২ কোটি ১৭ লাখ ৯৫ হাজার ৩৩৭ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাওলানা মোহাম্মদউল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর ১৫ লাখ ১০ হাজার ৪৫৬ ভোট পান। [১২]

এই নির্বাচনে দেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৩৯ লাখ ১২ হাজার ৪৪৩ জন। ১৯৮৬ সালের ২৩ অক্টোবর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।[১৩]

এরশাদ বলেন, জাতির প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সরকারের আরও বেশি গনতন্ত্রায়ন, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিল্প ভিত্তিক গড়ে তোলা এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন, মুলতঃ ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জেনারেল এরশাদের শাসনকালকে বৈধ করার ক্ষেত্রে এ নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ তার শাসনকালকে সম্পূর্ণরূপে বেসামরিকীকরণ করতে সক্ষম হন।

১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ

জরুরী অবস্থা ঘোষণা সত্ত্বেও বিরোধী জোট ও দল গুলোর এ দফা দুর্বার আন্দোলনের মুখে ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।[১৪]

৮ দল, ৭ দল, ও ৫ দলের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়। আন্দোলনরত সব জোট দল জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অধীনে আর কোনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেনা বলে ঘোষণা করে। এবং নির্বাচন প্রতিরোধ করার ডাক দেয়। বিরোধী দলগুলো নির্বাচন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন ১৭,১৮,১৯ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে ঘেরাওসহ প্রতিরোধ মূলক কর্মসূচি ঘোষণা করে জেনারেল এরশাদের প্ররোচনায় নির্বাচন কমিশন এরমধ্যে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে পুনরায় ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ নির্ধারণ করে পাশাপাশি ১৯৮৮ সালের ২৫ জানুয়ারি সরকার এক নতুন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সব ধরনের নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ করে। [১৫]

অবশেষে পুনরায় আরেকটি ভোটার তালিকা এবং প্রতিযোগীতাহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। নির্বাচনে কোন বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেননি। এ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি ও জেনারেল এরশাদ সমর্থক কম্বাইন্ড অ-পজিশন পার্টি, জাতীয়

সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ) ও ফ্রিডম পার্টি সহ মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। পূর্ব নির্ধারিত ফলাফল যা হবার তাই সম্পন্ন হয়।। এতে যথারীতি জেনারেল হুসেইন মহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি তিন চতুর্থাংশের ও বেশি আসনে জয়লাভ করে বলে সরকারী ঘোষণায় বলা হয়। [১৬]

বিরোধী দল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত এ নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরুপঃ

দলেরনাম	আসনলাভ	প্রাপ্তভোট	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয়পার্টি	২৫১	১,৭৬,৮০১৩৩	৬৮.৪৪
সম্মিলিতবিরোধী দল	১৯	৩২,৬৩,৩৪০	১২.৬৩
জাসদ(সিরাজ)	৩	৩,০৯,৬৬৬	১.২০
ফ্রিডমপার্টি	২	৮,৫০,২৮৪	৩.২৯
স্বতন্ত্রপার্টি	২৫	৩৪,৮৭,৪৫৭	১৩.৫০
অন্যান্যদল	-	২,৪২,৫৭১	০.৯৪

(Source: Government of the peoples Republic of Bangladesh press information Department, A background paper on Bangladesh fifth parliament (Jatiyasangsad) Election, handout No. 429, February 20, 1991)

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের করা সংবিধান সংশোধন সমূহঃ

এরশাদের প্রায় ৯ বছরের শাসন আমলে চারবার সংবিধান সংশোধন করা হয়, যথাঃসপ্তমসংশোধনী, অষ্টম সংশোধনী, নবম সংশোধনী ও দশম সংশোধনী।[১৭]

সপ্তম সংশোধনীঃ

১৯৮৬ সালের **১০** নভেম্বর জাতীয় সংসদে সংবিধানের সপ্তমসংশোধনী আইন পাশ হয়। **১৯৮২** সালের ২৪ মার্চ থেকে **১৯৮৬** সালের **১০** নভেম্বর সামরিক আইন চলাকালে ঘোষিত সকল আদেশ নির্দেশ, ফরমান, গৃহীত সকল ব্যবস্থা অনুমোদন দ্বারা বৈধ করা এ সংশোধনীর প্রধান উদ্দেশ্য। এ দ্বারা বিচারকদের সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছর পুনঃনির্ধারন করা হয়।

অষ্টম সংশোধনীঃ

১৯৮৮ সালের ৭ জুন অষ্টম সংশোধনী বিলটি সংসদে পাশ হয়। এতে বলা হয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম হবে ইসলাম। এটি পাশের পর সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এরশাদ তার অবৈধ শাসনকে বৈধকরণ এবং জনগণের সমর্থন লাভের যে এ সংশোধনী আনেন তা স্পষ্ট। অষ্টম সংশোধনী দ্বারা রংপুর, যশোর, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা ও

চট্টগ্রাম দেশের এ ৬টি জেলা সদরে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের ও বিধান করা হয়। এটিও প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। **১৯৮৯** সালের ২ সেপ্টেম্বর দেশের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে পূর্বে দাখিল-কৃত এক রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ৮ম সংশোধনীর হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের এই অংশ সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষিত হয়। ফলে, জেলা সদরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন বাতিল করা হয়।

নবম সংশোধনীঃ

১৯৮৯ সালের **১০** জুলাই সংবিধান এর নবম সংশোধনী বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত এবং তার মেয়াদ প্রেসিডেন্টের মর্জির উপর না রেখে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রেসিডেন্টের অনুরূপ একই সময় সরাসরি নির্বাচন এবং মেয়াদ বা কার্যকাল ৫ বছর স্থির হয়। একাধিক-ক্রমে দুই মেয়াদের অধিক কেউ স্থায়ী পদে থাকবেনা এ মর্মে বিধান করা হয়। আরও স্থির করা হয় যে, প্রয়োজনে একে অন্যের কাছে স্বাক্ষর যুক্ত পত্র-যোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন। **১৯৯১** সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃ-প্রবর্তিত হবে নবম সংশোধনীর ভাইস প্রেসিডেন্টের অংশসহ অনেক কিছু বাতিল বা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

দশম সংশোধনীঃ

১৯৯০ সালের **১২** জুন সংসদে দশম সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয়। এ দ্বারা জাতিয় সংসদে **৩০**টি আসন **১০** বছর মেয়াদে কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এবং পরোক্ষ পদ্ধতিতে এসব নির্বাচনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার বিধান নতুন করে করা হয়।[১৮]

৪.৪ এরশাদের সামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জঃ

সামরিকীকরণ কিঃ সাধারনভাবে অসামরিক ক্রিয়াকলাপে সামরিক বাহিনী জড়িয়ে পড়াকে সামরিকীকরণ বলে। অসামরিক কর্তৃপক্ষের স্থলে সামরিক কর্তৃপক্ষ আসীন হবে এবং এর মধ্যে বল প্রয়োগের উপাদান বিদ্যমান থাকবে। অসামরিক কর্তৃপক্ষ কতৃক অনুসৃত নীতি সামরিক বাহীনি প্রত্যাখ্যান করে নিজের নীতি প্রয়োগ করার ব্যাবস্থা নিতে পারে। বিস্তৃতভাবে বলা যায়, সামরিকীকরণ হল একটি দেশের ভিতর থেকেই যুদ্ধের জন্য সাংস্কৃতিক, প্রতীকী এবং বস্তুগত প্রস্তুতি নেয়ার একটি প্রক্রিয়া, নৃবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, সামরিকীকরণ এবং রাষ্ট্রীয় সামরিকবাহিনীর উপস্থিতি বিশ্বের অনেক সমাজ ও সংস্কৃতিতে 'দৈনিক জীবন'-কে স্পষ্টভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে সামরিকীকরণ একটি ইচ্ছাকৃত প্রক্রিয়া, যা একটি রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি দেশের সামরিকীকরণের মাধ্যমে চারটি প্রধান পরিবর্তন ঘটে: সম্প্রসারিত সামরিক শক্তি কাঠামো; রাজনীতিতে সামরিক প্রাধান্য; রাজনৈতিক সমস্যার জবরদস্তিমূলক সমাধানের জন্য অগ্রাধিকার; এবং সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সহিংসতার জন্য সাংস্কৃতিক সমর্থন।

সামরিকীকরণ গণতন্ত্রের জন্য বিরাট হুমকি, এমন কি দেশে সশস্ত্র বাহীনির সার্বিক উপস্থিতি, সশস্ত্র সংঘর্ষের অনুপস্থিতিতেও সামরিকীকরণের মাধ্যমে দেশে মানবাধিকার লজ্ঘন হতে পারে, যার মধ্যে বাধ্যতামূলক শ্রম, কৌতুকপূর্ণ কর আরোপ এবং জমি দখল; নির্বিচারে গ্রেপ্তার, আটক, গুম এবং মৃত্যুদণ্ড সহ বহুবিধ অবিচারে ভরে যায় দেশ। যার বাস্তব উদাহরন আমরা দীর্ঘকাল ব্যপী পার্শ্ববর্তি দেশ মিয়ানমারের পরিস্থিতি দেখে অনুধাবন করতে পারি।

গণতন্ত্রায়নঃ জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের সরকারি নীতি নির্ধারনে ও কাজে কার্যকরি প্রভাব থাকলে তাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা হয়। গনতন্ত্র বলতে আমরা সেই জাতীয় সরকার বুঝি যার সদস্যগণ জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয়। জনগনের সার্বিক কল্যাণের জন্য শাসন চালায় এবং জনগনের মধ্য থেকে আসেন।জনগনের কল্যানে এবং জনগণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সরকার দেশ পরিচালনা করলে তাকে গণতন্ত্রায়ন বলে। গণতন্ত্রায়ন গ্রিক নগররাষ্ট্র থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার বছর থেকে গণতন্ত্র জনপ্রিয় আদর্শ হিসেবে অনুসৃত হয়ে আসছে। প্রথমত জীবনাচার এবং দ্বিতীয়ত সুনির্দিষ্ট একটি পদ্ধতির মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠা পায়। গণতন্ত্রায়ন মুলতঃ গণতন্ত্রে পৌঁছানোর একটি প্রক্রিয়া। লর্ড ব্রাইস ১৮৮৮ সালে ‘গণতন্ত্রায়ন’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। মনে করা হয়, ফরাসি বিপ্লবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে ব্রাইস গণতন্ত্র বাস্তবায়নের প্রথা-পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন, যদিও গ্রিক নগররাষ্ট্র থেকে গণতন্ত্রের সূচনা তথাপি এর প্রতিষ্ঠানিকতা ও পদ্ধতিগত অনুসরণ শুরু হয় ফরাসি বিপ্লবের পর। প্রথমত ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্রগুলোতে পরে আমেরিকায়। ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে গণতন্ত্রের জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯০ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত উন্নত জাতিগুলোয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণতা লাভ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একে গণতন্ত্রায়নের ‘প্রথম তরঙ্গ’ বলে অভিহিত করেন। এর গতি ছিল মন্থর

কিন্তু প্রতিষ্ঠা ছিল দীর্ঘস্থায়ী। এরপর প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোসহ পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্রের জয়জয়াকার লক্ষ করা যায়। একে গণতন্ত্রায়নের ‘দ্বিতীয় তরঙ্গ’ বলে অভিহিত করা যায়। মার্কিন শান্তিবাদী প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্রায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-পরবর্তী ১০০ বছরে তাদের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী কুৎসিত ভূমিকা ছিল না। মনরো ডকট্রিনের ঘোষিত নীতিমালার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে, আমেরিকা আমেরিকানদের। এর ফলে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগিজরা তাদের পশ্চিম গোলার্ধের উপনিবেশগুলো পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর অবধারিত তরঙ্গ আছড়ে পড়ে পূর্ব গোলার্ধে। ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো। স্বাধীনতা লাভ করে ব্রিটিশের সবচেয়ে বৃহৎ ও সমৃদ্ধ উপনিবেশ ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতা লাভের পর এসব দেশে গণতন্ত্রায়নের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তবে সব দেশে সমানতালে এর বিকাশ ঘটেনি। যেমন ভারতের নেতৃত্ব রাজনীতিকদের হাতে থাকার ফলে গণতন্ত্রায়ন সহজ হয়। অপর দিকে একই সাথে স্বাধীনতা লাভ করলেও পাকিস্তানের নেতৃত্ব সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে থাকার কারণে পাকিস্থানে গণতন্ত্রায়ন ব্যাহত হয়। পরবর্তীকালে এই আমলাতন্ত্রের প্রভাব বাংলাদেশেও পরিলক্ষিত হয়েছে। ফ্রিডম হাউজের এক সমীক্ষা মোতাবেক ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের আরেকটি ‘তরঙ্গ’ লক্ষ করা যায়। এই সময়ে বাংলাদেশেও সামরিকতন্ত্রের পতন হলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

এরশাদের ক্ষমতায় আরোহনঃ

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২-৯০ সময়কালে রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, রাজনীতি এবং আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড সব কিছুর অস্তিত্ব ছিল একটা অসাংবিধানিক কন্সটিটুয়েন্সির ওপর। আর সেটি হচ্ছে সামরিক বাহিনী। বাস্তব ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ থেকে শুরু করে ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্সি পর্যন্ত সর্বত্রই সামরিক বাহিনী ছিলসর্বাগ্রে ও চূড়ান্ত, ১৯৮২ - ৯০ পর্যায়ে সামরিক বাহিনী হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি রাষ্ট্র কাঠামো ও সরকারের মূল নিয়ন্ত্রক। এ সময়ের মধ্যেই সর্বগ্রাসী সামরিকীকরণঃ করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করার পর থেকে সামরিকীকরণ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ব্যাপক মাত্রায় শুরু হয়। সরকারের সব ক্ষেত্রে প্রশাসনের সব বিভাগ ও শাখায় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রাক্তন ও বর্তমান উভয়ই ব্যাপক মাত্রায় পদ দখল করতে থাকে। বিষয়টি সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, প্রধান প্রধান পদসমূহের বিশাল অংশই সামরিক সদস্যদের দখলিকৃত হয়ে পড়ে।

নিজের আসন সুসংহত করার পরই এরশাদ সরকার মনোযোগ দেন সিভিলপ্রশাসনের সামরিকীকরনে, প্রশাসন পুনর্বিন্যস্ত করার জন্য ব্রিগেডিয়ার এনামুল হক খানের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন, যার ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই ছিলেন সামরিক বাহিনীর (২ জন লে: কর্নেল ও ১ জন মেজর) “এনাম কমিটি নামে পরিচিত এ কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/কর্পোরেশন ইত্যাদির ৩০হাজার ২৫৫ টি পদ হ্রাস করে ২ হাজার ৮৭৩ টি পদের স্বীকৃতি দেয়। ‘এনাম কমিটির’ কাজ সম্পর্কে সরকারি গেজেটে মন্তব্য করা হয়। জাতি এতে উপকৃত হবে।[১৯]

এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে দ্রুতলয়ে সেনা অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে আসেন প্রশাসনে। এরশাদ সরকার এভাবে প্রশাসনে সৃষ্টি করেছিলেন নতুন এক শ্রেণী যার পরিচিতি হয়ে উঠেছিল ('অবঃ') নামে। এদের নিয়োগের ব্যাপারে যখন যে নিয়ম প্রয়োজন হতো তাই বাস্তবায়ন করা হতো। এরা এক দিকে যেমন সেনাবাহিনীর সুযোগ সুবিধা পেতেন একই সাথে বেসামরিক প্রশাসনের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। এক হিসাবে জানা যায় প্রায় ৯০ টি বিভিন্ন ধরনের সংস্থার প্রধান পদে এক- তৃতীয়াংশ ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসাররা।[২০]

এরশাদ আমলে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সামরিকীকরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণালয় (আপন বিভাগ) এ সামরিকীররণঃ

জেনারেল এরশাদ কর্তৃক সামরিকীকরণের ব্যাপক প্রক্রিয়ার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রথমেই রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অবস্থা তুলে ধরেছি। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সহকারী সচিব, পিএস ও সুপ্রিম কমান্ডার, রাষ্ট্রপতির ৪ জন এডিসি, সর্বাধিনায়কের পিএসও এবং প্রধান সমন্বয়কারীএরা সবাই ছিলেন সামরিক অফিসার। এছাড়া ট্রান্সপোর্ট অফিসার, সিনিয়র কম্পট্রোলার, কম্পট্রোলার সহ কম্পট্রোলার ট্রান্সপোর্ট সুপারিনটেনডেন্ট। মহিলা মেডিকেল অফিসার (বঙ্গভবন চিকিৎসালয়) এবং সিও পিজিআর সেনানিবাস রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্টের সবাই সামরিক অফিসার ছিলেন। তেজগাঁও পুরানো সংসদ ভবনে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের যুগ্মসচিব (মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ) প্রাকৃতিক জলসম্পদ ও সমাজ উন্নয়ন অনুবিভাগে মহাপরিচালক এবং জাতীয় নিরাপত্তার সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেলেচেয়ারম্যানসহ অতিরিক্ত পরিচালক, যুগ্ম পরিচালক পদে সবাই সামরিক অফিসার ছিলেন।[২১]

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২ জন যুগ্ম সচিব ছিলেন ব্রিগেডিয়ার, ২ জন উপ-সচিব ছিলেন মেজর, প্রকৌশল উপদেষ্টা ছিলেন একজন কর্নেল, প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংস্থার পরিচালক ছিলেন একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন।[২২]

১৯৮৭ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর সব কর্মকাণ্ডে ওপর থেকে বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বিলোপ করার, দৃঢ় পরিকল্পনানুযায়ী রুলস অব বিজনেস ১৯৭৫ এর প্রথম ও তৃতীয় তফসিলি অন্যান্য বিধি স্বেচ্ছাচারী-ভাবে সংশোধন করা হয়।[২৩]

এভাবে সামরিক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ সম্পূর্ণরূপে সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে ইতিপূর্বেই তিনি ৬টি বিভাগ ও সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, সুপ্রিম কমান্ড হেড কোয়ার্টার্স ডিভিশন গঠন করার পর এ সংখ্যা ৭ এ দাঁড়ায়। শুধু তাই নয় এরপর নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও জাতিয় সংসদ সচিবালয় ও নিয়ে আসা হয় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে। এভাবে এ সময়ে একাধারে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরন ও বেসামরিক ক্ষেত্রের সামরিকীকরণের বে-নজির দৃষ্টান্ত তৈরি করেন বন্দুকের নলের জোরে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক এরশাদ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সামরিকীকরণঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব (ডিএস) পদে নিযুক্ত ছিলেন একজন মেজর। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশ বিভাগে ২৩ জন লেফটেন্যান্ট থেকে মেজর পদ মর্যাদার অফিসারকে নিয়োগ করা হয়। ডিআইজি পদে নিযুক্ত হয় ১৪ জন। এদের মধ্যে ৯ জন গ্রাজুয়েট ডিগ্রীধারী, ৬ জন আইএ, এস-পি পদে নিয়োগ করা হয় ৯ জন কে। এদের মধ্যে ২ জন আইএ পাস, বাকি ৭ জন গ্রাজুয়েট, উল্লেখ্য এদের সমমর্যাদার অফিসাররা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (বিসিএস) উত্তীর্ণ হয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ শেষে নিযুক্তি পেতেন পুলিশ প্রশাসনে অন্যদিকে এসব সামরিক কর্মকর্তাকে ২ বছর সিনিয়রটি দেয়া হয়। ফলে কর্মরত বেসামরিক অফিসাররা জুনিয়র হয়ে যান।[২৪]

৬ জন আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ছিলেন, একজন মেজর জেনারেল বাকি ৮ জন কর্মকর্তা ছিলেন ক্যাপ্টেন, মেজর, লে: কর্নেল, কর্নেল ও ব্রিগেডিয়ার, বাকি ২ জন কর্মকর্তা মেজর, কারা পরিদফতরের প্রধান ছিলেন একজন কর্নেল।[২৫]

১৯৯০ এর ডিসেম্বর পুলিশ বিভাগের সদস্যরা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক গোপন প্রচারপত্র প্রকাশ করে। ওই প্রচার পত্রে স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক স্লোগান রাখা হয়। এ বিভাগের সামরিকীকরনঃ প্রসঙ্গে প্রচারপত্রটিতে বলা হয়। গত ৮ বছরে বহু দুর্নীতিবাজ সামরিক কর্মকর্তাকে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ২৩ জন এস-পি পূর্বে সামরিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন, এছাড়া পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগের জন্য সামরিক বাহিনীর প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের দয়া দাক্ষিণ্যর ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে প্রশাসনের এ গুরুত্বপূর্ণ অংশটি তার স্বাধীন ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছে।[২৬]

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সামরিকীকরণঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে মিলিটারি এটাচির পদে তো স্বাভাবিকভাবেই সামরিক অফিসাররা রয়েছেন, এছাড়া এসময় দূতাবাসগুলোর অন্যান্য বেসামরিক পদেও সামরিক অফিসাররা দখল করেছে বহুলাংশে। এরশাদ শাসনামলে ৩০ জন অবসরপ্রাপ্ত কে ঢোকানো হয়েছিল ইউরোপ ও সমৃদ্ধ দেশের দুতাবাসের বিভিন্ন পদে। এরশাদের দুঃশাসনের ৯ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এরশাদ কখনো সরাসরি নিজে কখনো তার অনুগত ৩ জন এ আর এস দোহা, হুমায়ুন রসিদ চৌধুরী এবং আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মাধ্যমে বারবার এ মন্ত্রণালয়কে আক্রমণ করেছে। ক্ষতবিক্ষত করেছে এর কাঠামো, কর্মপ্রক্রিয়া, ভাবমূর্তিকে।[২৭]

এ সময়ে ১১ জন রাষ্ট্রদূত ছিলেন অব: জেনারেল ও ২ অব: ব্রিগেডিয়ার, প্রটোকল প্রধান ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার, উচ্চপদে ছিলেন ১৪ জন অব মেজর। বিবিসি এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছিল, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অন্য সার্ভিসের লোক এনে নিয়োগের ফলে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে ফরেন সার্ভিস ক্যাডার অন্তর্ভুক্ত জনবল সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে চলেছে।[২৮]

১৯৮২-৯০ পর্যন্ত পররাষ্ট্র দফতর কিভাবে চলছে সে সম্পর্কে একটি পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় ' পররাষ্ট্র দফতরে নিয়োগ ও বদলি ছিল এরশাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপর। এরশাদ যা বলতেন তাই হতো। এ সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে মিনি ক্যান্টনমেন্ট বলা হতো। এতে পেশাদার কূটনীতিকদের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিলো। নিয়মবহির্ভূত ভাবে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হতো।

বেসামরিক প্রশাসনে সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তৎকালীন বিসিএস(প্রশাসন) মহাসচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, এরশাদ সরকার দীর্ঘদিন তাকে ওএসডি করে রাখেন।[২৯]

একশন কমিটি ফর সিভিল রুল জানায়। বাংলাদেশ পুলিশ সহ বেসামরিক প্রশাসনের সব পদ হতে সামরিক উর্দিধারীদের অপসারণ করতে হবে।[৩০]

এরশাদ কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সামরিকীকরণের মাধ্যমে কাঠামোগত অখণ্ডতার অপর আঘাত হেনেছে এবং নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।[৩১]

আমলাতন্ত্রকে সামরিকীকরণঃ

আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। আমলারাই প্রকৃতপক্ষে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলনীতি নির্ধারক, মুলতঃ আমলাদের রাজনীতিতে টেনে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেন সামরিক ও স্বৈরশাসকেরা । এরশাদ শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০) বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের সহযোগী হয়ে কিরূপ পরিগ্রহ করে তা তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হল।

এরশাদ সরকার তার নয় বছরের শাসনামলে আমলাতন্ত্র কে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। এ সময় জি-১০ বলে একটি শব্দ শোনা যেত। এ জি-১০ হচ্ছে ১০ জনের একটি গ্রুপ। শীর্ষস্থানীয় আমলাদের সমন্বয়ে এই জি-১০ গঠিত হয়। এরা সরাসরি জেনারেল এরশাদের সংগে নিয়মিত বৈঠক ও যোগাযোগ রক্ষা করতো।[৩২]

আমলাতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি পরিণত হয়েছিল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সেবাদাসে, বিশিষ্ট সাংবাদিক নাজিমুদ্দিন মোস্তান এ সময়ের আমলাতান্ত্রিক শাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পয়েল সিস্টেমের সঙ্গে তুলনা করে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে এরশাদ সরকার তার শাসনামলে গুপ্ত সংস্থা, সচিবালয় কেবিনেট, সরকারি সংস্থা প্রচার মাধ্যম, এমনকি ডাকঘরে পর্যন্ত তার শিখণ্ডী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে যাকে বলা হয় স্পয়েল সিস্টেম।[৩৩]

এ আমলাদের সহায়তাতেই স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধীদের দমন, পীড়ন, হত্যা, ভোট ডাকাতির নির্বাচনী প্রহসন মূলক নাটক মঞ্চায়ন, মিডিয়া ক্যু, সরকারি উৎস থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট এবং তা বিদেশে পাচার, শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে প্রচার প্রপাগন্ডা, ভাড়া করা লোক দিয়ে জনসভার আয়োজন , বছরের পর বছর শিক্ষাঙ্গন বন্ধ রেখে যুব সমাজ কে চরম অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়া। সব অপকর্ম সাধন করে, ফলে সমাজে মারাত্মক বিশৃংখলা নেমে আসে। আমরা দেখতে পাই ১৯৮৭ সালের সাপ্তাহিক বিচিত্রার এক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন' মিডলম্যান আমলাতন্ত্রের বিস্তার শীর্ষ এ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ ছিল আমলাতান্ত্রিক বিস্তার হিসেবে

বিকাশ ঘটেছে মিডল-ম্যান আর তাদের মাধ্যমে ১০ কোটি লোকের সম্পদ চলে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আমলারাই এদেশের ক্ষমতার মুল উৎস দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের নীতি নির্ধারণে তারা আইন প্রণয়ন করেন আমদানি রফতানি শিল্প ও করনীতি নির্ধারণ করেন। কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার ফলে তাদের হাতে থেকে যায় অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা বণ্টনের ক্ষমতা। ১৭ আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পাশাপাশি স্বৈর-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভয়াবহতা (৮২-৯০) এ সময়ে বাংলাদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীয় নেতৃত্ব বিকশিত হয়। শিক্ষাঙ্গনের তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুস্থতাই জাতির অগ্রগতির সূচক। অথচ বাংলাদেশে (৮২-৯০) এ সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষাঙ্গন গুলো। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ করা হয়েছিল কলুষিত এবং সন্ত্রাস কবলিত। নিত্যকার ধর্মঘট, বিক্ষোভ , মিছিল, প্রতিপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে উন্মুক্ত অস্ত্রের মহড়া , সংঘর্ষ , বোমাবাজি, বন্দুক লড়াই প্রতিদিনকার রুটিন মাফিক চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়ে কারণে অকারণে সামান্য ব্যাপারে একের পর এক বন্ধ ঘোষণা করা হত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ফলে যথাসময়ে সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হতোনা, পরীক্ষা পিছিয়ে পড়তো আবার চলমান পরীক্ষা ও বন্ধ ঘোষণা করা হতো, ফলে ছাত্রছাত্রীদের মহামূল্যবান সময় হারিয়ে যেত জীবন থেকে, হতাশার মাঝে জীবন নিপতিত হতো ছাত্রছাত্রীরা। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা উদাহরণ ছিলনা। উচ্চ শিক্ষার সব কটি প্রতিষ্ঠানে এ সময়ে কম বেশি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯ এর গনঅভ্যুত্থান , ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে এদেশের ছাত্র সমাজের সুমহান ঐতিহ্য আমরা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু নিছক রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সেই ছাত্রসমাজকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্বৈরাচারী সরকার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে বিপথে পরিচালিত করে যে বিধ্বংসী প্রহসন চালিয়েছিলেন তার দেখে (১৯৮২-৯০) নিজেদেরই অপরাধী মনে হয়।

স্বৈরশাসক সবসময়ই চায় ছাত্ররা বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকুক, যেন দেশে কার্যকর কোন ছাত্র আন্দোলন গড়ে না উঠে। সন্ত্রাসের কারণে অভিভাবক মহলে বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠুক। যাতে করে ছাত্ররা স্বৈরচারের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় কোন অবস্থান গ্রহণ করতে না পারে এবং সেই সুযোগে স্বৈরাচারী সরকার তার শাখা প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের হাতকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

সামরিক ও স্বৈরশাসক এরশাদ ১৪ ফেব্রুয়ারির পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। এরশাদ বিশ্বাস করতেন সবাইকে ক্রয় করা সম্ভব এবং তিনি এই নীতির প্রয়োগ ও করেছেন সফল ভাবে। অবৈধ অর্থের সংস্থান এবং তাদের নিরাপত্তার (দায়মুক্তির) নিশ্চয়তা ও দিয়ে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। শুধু চেয়েছিলেন ছাত্র সংগঠন গুলো যেন ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। এজন্য তিনি কিছু অসাধু শিক্ষকের সেবা ও গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে ঝানু ব্যক্তিদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে দিয়েছেন। ছাত্র শক্তিকে নিজেদের মাঝে কোন্দলে জড়িত রেখে নিজেদের সীমানায় বন্দি রাখতে চেয়েছিলেন।

এ কৌশলে ভালো ফল ও পেয়েছিলেন কিছুদিন, বিভক্ত হয়ে ছাত্ররা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেছে। নিজেদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়েছে। ফলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য ম্লান হয়ে গিয়েছিল। আবার ছাত্রদের একাংশের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে, অবৈধ পাওয়ার এবং অর্থ ও সম্পদের সাহায্যে তাদের কে নীতিহীন মাস্তানে পরিণত করার পুরানো কায়দা ১৯৮২-৯০ এর সময়ে তা রীতিমত আর্টে পরিণত হয়েছিল।[৩৪]

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সরকার থেকে নিজস্ব লোক খুঁজে বের করে তাদের হাতে অর্থ ও অস্ত্র তুলে দেয়া হতো। তাতে লাভ হতো এই যে নির্দিষ্ট সময় হাঙ্গামা সৃষ্টি করলেও তার দায় সরকারের উপর পড়তো ছাত্র সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের ওপর।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (১৯৬২-৯০) এ সময়ে এরশাদ সরকার সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ছাত্রদের ওপর কি পরিমান দমন পীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছিলেন তার অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অশান্ত পরিবেশের কয়েকটি দন্ড চিত্র উপস্থাপন করা হলঃ

২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারির প্রতিবাদ করলে পরদিন সকাল বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাসগুলো আক্রান্ত হয়। সামরিক বাহিনী হলগুলোতে চলে আসে। প্রচণ্ড ত্রাস সৃষ্টি করে। সামরিক সরকারের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পোষ্টার তোলা হয়। সামরিক বিধি বলে ৫ জনের বেশি একত্রে জমায়েত নিষিদ্ধ করে। এমনকি মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের জন্য ও রমনার পুলিশ কন্ট্রোল (রমনা ও আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসনের কার্যালয় থেকে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেয়।[৩৫]

১৯৮২ সালের ৭ নভেম্বর উপলক্ষে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক মিছিলের আয়োজন করে। মিছিল চলাকালীন সময়ে কর্তপক্ষের অনুমতির কোন তোয়াক্কা না করেই পুলিশ অকস্মাৎ মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের খন্ড যুদ্ধ। এ সময় মধুর ক্যান্টিনে অবস্থানরত অন্যান্য সংগঠনের নেতা কর্মীরা ও পুলিশ প্রতিরোধে এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করে। ক্রমাগত কাঁদানে গ্যাস ও গুলি সমগ্র ক্যাম্পাসকে কাঁপিয়ে তোলে। পুলিশ সমগ্র ক্যাম্পাসে ঢুকে শ্রেণী কক্ষের কাঁচের জানালা ভাঙতে থাকে এবং জানালা ফুটো করে গ্যাসের সেল ক্লাসরত ছাত্র শিক্ষকদের ওপর মারতে থাকে ।[৩৬]

এভাবে সমগ্র ক্যাম্পাসে এক বিভীষিকাময় ঘটনার উদ্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয় (শিক্ষক সমিতি সামরিক সরকারের এ হস্তক্ষেপকে নজিরবিহীন ও নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করে।[৩৭]

এই সময়ে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করা হয় রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ারে। একদিকে রাজনৈতিক দল অন্যদিকে সরকার তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও চাপ প্রয়োগের জন্য যেন এই সময়ে অস্ত্রের ব্যবহার রাজনৈতিকভাবে অনুমোদিত হয়ে গেছে। (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব দলের প্রভাব আছে সব রাজনৈতিক দল রাজনীতির ক্ষেত্রে এ সময়ে বেশি অস্ত্রের ব্যবহার অনুমোদন করে। এর কারণ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছানোর চেষ্টা, কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রথম সোপান হিসেবে ধরা হয় ছাত্রাবাস ও ইউনিয়ন দখল। এ ক্ষমতা কিসের এবং কোথায় তার উত্তর সহজ। ছাত্রাবাসগুলোতে প্রভাব বিস্তার করা হোক, সেখানে কেবল নিজ

দলীয়রাই থাকবে লক্ষ্য ইউনিয়ন নির্বাচনে জয় লাভ এবং ইউনিয়নের ক্ষমতা দখল। কিভাবে ক্ষমতা দখলে আসবে, সে প্রশ্ন অবান্তর, মুখ্য উদ্দেশ্য হলো (ক্ষমতা) দখল। সেই ক্ষমতা কলেজগুলো থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে সরকার পক্ষের শক্তি বা জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের অন্যতম ঘাটি । এভাবে বিভিন্ন মহল নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের ব্যবহার করেছে। তবে শিক্ষাঙ্গনকে বিপর্যস্থ করে তুলেছিল অস্ত্র। গোড়া থেকেই এক শ্রেণীর ছাত্রদের হাতে অর্থের জোগান দিয়েছে সরকারের একটি বিশেষ এজেন্সি। ফলে বিভিন্ন ছাত্রদলের ছদ্মাবরণে থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্ত্রের মহড়া চলতো। যার জের হিসেবে ছাত্র সংগঠনের ২টি দলের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ নিত্যদিনের চিত্র হয়ে দাড়িয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বন্দুক লড়াই এবং হল দখলের কিছু চিত্র তুলে ধরা হল।

১৯৮৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী সরকার সমর্থক নতুন ছাত্র সমাজের অস্ত্রধারীদের সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রাবাস থেকে বিতাড়িত করলে ক্যাম্পাসে কিছু সময়ের জন্য শান্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু ৮৬ এর মে-জুন মাসে বিরোধী জোটের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসগুলো দখলে এনে শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে। ২৫ জুন (৮৭) এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ছাত্রবাসগুলো লেবানন নগরীতে পরিণত হয়। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, **১৯৮২-৮৯** সালের ৩০ জুন পর্যন্ত্র ছাত্র সংগঠন গুলোর মধ্যে **৩১৮** টি সংঘর্ষ হয়েছে। এই একই সময়ের ছাত্র সংগঠন গুলোর মধ্যে বিরোধের ফলে **১১**টি ছাত্রাবাস ভস্মীভূত হয়েছে। ছাত্রবাসের **২১**টি কক্ষ পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে। **১৪২**টি বাস, মিনিবাস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ফলে ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্তঃ বিরোধের সংঘর্ষে অস্থির হতে থাকে ক্যাম্পাস। প্রতিদিনই ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন উপদল একে অপরের বিরুদ্ধে গুলি, বোমাবাজি চালাতে থাকে। বিভিন্ন উপদলের লাগাতার সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিভীষিকা নেমে আসে। সুস্থ রাজনীতি চর্চার চেয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রবণতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। ছাত্র সংগঠনগুলো সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে কখন প্রতিপক্ষের দুর্বল জায়গায় পাওয়া যাবে।

এ সময় ছাত্রাবাসগুলো থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে স্মরণকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় **১৯৮৬-৯০** এর ৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলোতে ৩০ বার তল্লাসি হয়েছে। তবুও বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত হয়নি **১৯৮৫** সালের ২৬ অক্টোবর থেকে ৯০-এর ৬ আক্টোবর পর্যন্ত্র এ তল্লাশি অভিযানগুলো চালানো হয়। [৩৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও খোলা রাখার খতিয়ান

শিক্ষাবর্ষ (জুলাই – জুন)	অনির্ধারিত বন্ধ	মোট নির্ধারিত বন্ধ + নির্ধারিত ছুটি	শিক্ষাদিবস হয়েছে	শিক্ষাদিবস হওয়ার কথা
১৯৮০-৮১	১৭ দিন ছাত্র ধর্মঘট, ১৬ দিন সরকারী বন্ধ	**১১৯**	**১৭০**	**২১৩**
১৯৮১-৮২	১০ দিন ছাত্র ধর্মঘট, ৯০ দিন	**১৬৮**	**১৯৭**	**২০৭**

	সরকার কর্তৃক বন্ধ			
১৯৮২-৮৩	১১ দিন ছাত্র ধর্মঘট, ৩৩ দিন দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	২১৮	১৪৭	২২৪
১৯৮৩-৮৪	১১ দিন ছাত্র ধর্মঘট, ১২২ দিন দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৯৬	১৬৯	১৯৯
১৯৮৪-৮৫	১৭ দিন ছাত্র ধর্মঘট, ১৬ দিন দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	২৬৫	১০০	১৮৯
১৯৮৫-৮৬	৫০ দিন ছাত্র শিক্ষক ধর্মঘট, ৩৫ দিন দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৯২	১৭৩	২০৬
১৯৮৬-৮৭	২৩ দিন ছাত্র ধর্মঘট, ৬৪ দিন দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৯১	১৭৪	২৪৪
১৯৮৭-৮৮	১৭ দিন ছাত্র ধর্মঘট, ১৬ দিন দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১২২	১৮৫	১২৭

৩৯

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ক্যাম্পাসে মিছিল মিটিং চলাকালে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর ৪ বছরে অন্ততঃ ১৫ বার সশস্ত্র হামলা সংঘটিত হয়। সংঘর্ষ ঘটেছে ২০ বার। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন বাসায় যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে ২০ বার, ৮ বার ঘটেছে অগ্নিসংযোগের ঘটনা। প্রকাশ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ২৫ বার। এ সময়ের মধ্যে বিস্ফোরন ঘটানো হয়েছে প্রায় ৫০০ ককটেল ও হাতবোমা।[৪০] [সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৪ বর্গ, ২৯ সংখ্যা, ৪ জানুয়ারী, ১৯৮৯]

সংবাদকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন ছাত্রনেতা বলেন, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশি অভিযানের মধ্যে দিয়ে আবারো প্রমাণিত হলো অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা ক্যাম্পাসে খোলা আকারের সব কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় থাকে। এসব সংগঠন অস্ত্রধারীদের প্রশ্রয় দিয়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করেছে এবং সরকার এর সুযোগ নিচ্ছে।[৪১]

১৫ অক্টোবর (১৯৯০) যখন তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার অধিকার সম্পর্কিত একটি অধ্যাদেশ সরকার জারি করেন। সমগ্র শিক্ষিত সচেতন মহল সরকারের এ পদক্ষেপের নিন্দা করে উর্ধ্বতন সরকারি ও রাজনীতিবিদদের বেশির ভাগ সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে বলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দিনের পর দিন এভাবে বন্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। ফলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিরুদ্ধে ছাত্রদের অবস্থা সম্পর্কে কারো কোন মাথাব্যাথা ছিল না। ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো এমনটি একটি অবস্থানের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে থাকে, আর সুযোগ নিয়ে এরশাদ সরকার জোরপূর্বক ক্ষমতা আকড়ে রাখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে চরম আঘাত হানে, জরুরী অবস্থা কারফিউ জারি করে যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ও স্কুল বন্ধ করে দেয়। পাইকারি হারে ছাত্রদের গ্রেফতার ও দমননীতি চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংশস্ত্র মাস্তান ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের চারণক্ষেত্রে পরিণত করে।

ফলে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিলনা, স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ সময়ে যে জঘন্যতম বর্বরতা ও নৃশংসতা চালিয়ে ছিল সমস্ত বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে তাতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

নির্বাচনঃ

নির্বাচন পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের প্রতিফলিত হয় সেই নির্বাচন পদ্ধতি জেনারেল এরশাদের সামরিক ও স্বৈরাচারী শক্তির প্রয়োগে বাংলাদেশ (১৯৮২-৯০) সময়ে পরিণীত হয়েছিল এক প্রহসন ও তামাশার প্রতিষ্ঠান হিসাবে। নির্বাচন প্রথাকে এমনভাবে বিনষ্ট করা হয়েছিল যে সিভিল সমাজের সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে যায় নির্বাচন থেকে এবং তারা নির্ভর করে সামরিক আমলাতন্ত্রের উপর। বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০)সময়ে নির্বাচন গুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে সামরিক শাসনের অধীনে এবং স্বৈরাচারী কায়দায়। এ সময়ের ভিতরে যে কটা নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটির চেহারা একই । ভোটার না থাকলে ও চলবে ব্যালট বাক্স ভর্তি হলেই হল। পছন্দমতো ব্যক্তিরা নির্বাচিত হবেনই । সরকার বিভিন্ন নির্বাচনে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কে ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তার পূর্বক ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ঘোষণার ব্যবস্থা করে। পেশিশক্তি ও অর্থবলে অশুভ প্রভাবের জন্য ই সময়ের নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থা ছিলনা, এরশাদ সরকার তার নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন ব্যবস্থা দুমড়ে-মুচড়ে যেভাবে জনগণের কাছে অর্থহীন করে তুলছিলেন তাতে জনগণ রাজনীতি বিমুখ হয়েছিল। এ সময়ে নির্বাচনে প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ না করায় এবং সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী সাজানো নির্বাচন করাতে দেশে- বিদেশে এ নির্বাচনের কোন মূল্য ছিলনা। ভোট কেন্দ্রে যাওয়া এবং ভোট দেয়ার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ছিলনা। মূলত এরশাদ শাসনামলের সব নির্বাচনই তার সামরিক ও স্বৈরাচারী শক্তি প্রয়োগে প্রহসনের নির্বাচন। যার পেছনে কোন গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ও কোনও বৈধতা ছিলনা।

বিচার বিভাগঃ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা যে কোনও ন্যায়নিষ্ঠ এবং গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শর্ত । দেশে আইনের শাসন না থাকলে গণতন্ত্রের দাবি বা প্রতিষ্ঠা দুটিই সমান ভাবে মূল্যহীন। অথচ ৮২-৯০ সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিচার বিভাগ। স্বাধীন বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে জনগণকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। এরশাদ সরকার স্বাধীন বিচার বিভাগের ক্ষত্রে হস্তক্ষেপ করে তাকে বিকৃত করে। এ বিকৃতি সাধন করা হয় নানা ভাবে, প্রথমত, হাইকোর্টকে বিভক্ত করে জনগণের দোরগোড়ায় বিচারব্যবস্থাকে নিয়ে যাওয়ার নাম করে গৃহীত পদক্ষেপ। সামরিক ফরমানের মাধ্যমে-তিনি প্রথমে তিনি প্রথমে তিনটি পরে আরও তিনটি স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন করেন বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণের নামে। এর ফলে হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্টের একক সত্তা হিসেবে না থেকে পৃথক সত্ত্বায় রূপান্তরিত হয় সামরিক শাসনের মাধ্যমে। বিচারক নিয়োগের ব্যাপারটি রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়। বিচারকদের বয়স-সীমা বাড়ানো হয়েছে পূর্বের আইন বাতিল করে। বিভিন্ন ভাবে বিচার বিভাগের অপর সামরিক সরকার তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম রেখেছে (১৯৮২-৯০) পর্যন্ত।

সংবাদপত্রঃ

১৯৮২-৯০ সময়ে এরশাদ সরকারের আমলে মৌলিক অধিকার খর্বকারী বিশেষ ক্ষমতা আইনটি গোটা সংবাদপত্র শিল্পের মাথার অপর ডেমোক্লিসের খড়্গের মতো ঝুলেছিল। এ আইনের বলে যেকোনো সময়, যেকোনো সংবাদপত্রকে এমনকি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হতো। এরশাদ শাসনামলে বন্ধ সংবাদপত্রের তালিকায় রয়েছে দৈনিক খবর, দৈনিক বাংলার বানী, সাপ্তাহিক দেশবন্ধু, প্রহর, যায়যায়দিন, বিচিত্রা ও আরো কিছু সাময়িকী, বন্ধ সংবাদপত্রের দীর্ঘ তালিকা প্রমাণ করে সামরিক সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের মাত্রা।

সামরিক আইনবলে আরোপিত সরকারি বিধি- নিষেধের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রগুলোকে এসময়ে চলতে হতো অত্যন্ত সন্তর্পণে। একটু এদিক ওদিক হলেই নেমে আসতো পত্রিকা বন্ধের নোটিশ। ফলে সংবাদপত্রের জগৎ পরিণিত হয়েছিল এক দুঃসহ শ্বাসরুদ্ধর পরিবেশে।

সংস্কৃতিঃ

এরশাদের সামরিক যাঁতাকলের ১৯৮২-৯০ সময়ে ভয়ঙ্কর ভাবে দলিত-মথিত হয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। দুর্নীতি ও অরুচির কবলে পড়ে দেশের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো। এরশাদের সরকার দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমূলে ধ্বংস করে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে অনুপ্রবেশ ঘটানোর পায়তারা করে আসছিল ক্ষমতায় আসার শুরু থেকেই। সংস্কৃতিসেবি হিসেবে নিজেকে ও তার সরকারকে পরিচিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। এ কারণে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে একদল বুদ্ধিজীবী ক্রয় করেছিলেন এশীয় কবিতা উৎসব করতে। দৈনিক পত্রিকায় প্রথম পাতায় পর্যন্ত তার কবিতা ছাপা হয়েছিল। তারই চরম পদক্ষেপ হিসেবে গঠন করা হয় সংস্কৃতি কমিশন। দেশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মীয় ভাবধারা ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাদের প্রায় কোনও স্থান নেই তারাই হয়েছিল এ কমিশনের সদস্য| বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটির ক্ষেত্রে যে ২ টি সুপারিশ হয়েছে তা তার স্বাক্ষরের পর মুক্ত করা হয়েছে। দেশের সব পর্যায়ের সংস্কৃতিবান মানুষ ঘৃনাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে সংস্কৃতি কমিশন এবং সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ করেছেন। এরশাদ সংস্কৃতির পাশাপাশি ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুশাসন নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা ও চালান তার শাসনামলে।

এরশাদ সরকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যাদের নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন আমলা। ক্ষমতাসীনদের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে এদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোকে বসানো হয়েছিল। কিভাবে এরশাদ সরকার জনমত বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যাবে ১৯৮৮ সালে পেশ কৃত সংস্কৃতি কমিশন রিপোর্টে। এ রিপোর্টের প্রধান ২ জন উদ্যোক্তা হলেন ভাষা আন্দোলন বিরোধী ও প্রতিটি সামরিক সরকারের সমর্থক সৈয়দ আলী আহসান আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী একজন আমলা ও ডঃ এনামুল হক।

অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলঃ

লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ অস্ত্রের মুখে ক্ষমতাসীন গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সে সাথে তিনি সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সাত্তার সরকারের মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দেন এবং জাতীয় সংসদ বাতিল করে দেন। বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মত সামরিক শাসনের করতলগত হয়। এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে অধিষ্ঠিত করেন। সামরিক শাসন জারির যে সকল কারণ তিনি উল্লেখ করেন সেগুলোর একটিও দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। বস্তুত, অস্ত্রের ভয় দেখিয়েই এরশাদ স্বীয় ক্ষমতা লিপ্সা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলে উদ্যোগী হন। নির্বাচিত সাত্তার সরকারকে বন্দুকের নলের মুখে পদত্যাগে বাধ্য করে জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্র ও সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করেন।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ধ্বংসসাধনঃ

গণতন্ত্রের প্রতি বরাবরই এ দেশের মানুষ ছিল অনুরাগী। তারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বার বার বুকের রক্ত দিয়েছে। কিন্তু এরশাদ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করেই দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা দখল করেই তিনি বলেছিলেন, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করবেন। কিন্তু তার প্রতিশ্রুতির সাথে কাজের কোন মিলই ছিল না। মূলতঃ তার শাসনব্যবস্থা ছিল অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারমূলক। তার শাসনামলে যে কয়টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ প্রহসনমূলক, জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, বিচার বিভাগ সব কিছুই ছিল তার নিয়ন্ত্রণে এবং তিনি সকল ক্ষেত্রে হস্ত প্রসারিত করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করেন। ফলে দেশের সর্বস্তরের জনগণ এরশাদ সরকারের উপর হতে অবস্থা হারিয়ে ফেলে।

প্রহসনমূলক নির্বাচনঃ

এরশাদ সরকারের আমলে যতগুলো নির্বাচন হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল প্রহসনমূলক নির্বাচন। স্বীয় শাসন আমলকে বৈধকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্বাচনের আশ্রয় গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি এরশাদ। আর এ সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করেন। ভোট কারচুপি হতে শুরু করে নিজস্ব দল জাতীয় পাটি চর দখলের ন্যায় ভোট কেন্দ্রগুলোকে দখল করে নির্বাচনী ফলাফল তাদের অনুকুলে আনয়ন করে। এর ফলে নির্বাচনের প্রতি জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। নির্বাচন হারায় এর গ্রহণযোগ্যতা। এটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন নির্বাচন কমিশন কে নিজের স্বার্থে ব্যভার করে গণতান্ত্রিক সংকট সৃস্টি করেছেন।

প্রচার মাধ্যমগুলোর দলীয়করণঃ

যে কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহের নিরপেক্ষ ভূমিকা একান্তভাবে কাম্য। কিন্তু এরশাদ শাসনামলে এ মাধ্যমগুলোকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও দলীয়করণ করা হয়। দৈনিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিকীর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপকরন, সরকারের সমালোচনায় মুখর খবরের কাগজ ও সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের

প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। এছাড়াও বেতার ও টেলিভিশনে একপেশে বক্তৃতা, বিবৃতি ও সরকারের গুণকীর্তন করা ছিল নিত্য দিনের ব্যাপার। কোন প্রকার সমালোচনামূলক আলোচনা বা বক্তব্য এসব মিডিয়াতে স্থান পেতোনা। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোর এ অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ ও দলীয়করণ জনমনে সরকারের প্রতি চরম ঘৃনার উদ্রেক করেছিল। প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকলে গনতন্ত্র থাকেনা। প্রচারমাধ্যমের দলীয়করণের মাধ্যমে এরশাদ গনতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বংস সাধনঃ

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর থেকেই সামরিক শাসক এরশাদ দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মাধ্যমে ভাঙ্গণের সৃষ্টি করেন। ফলে বেশ কয়েকটি দল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়; আর এ সুযোগে সরকার তাদের উপর পুরোমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার সুযোগ পান। অনেক সময় বৃহৎ দলগুলোর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। তাদের উপর হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এরশাদ সরকারের দীর্ঘ নয় বছরের শাসনকালে দেশে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।ফলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ সুসংহত ও সুদৃঢ় হওয়াতো দূরের কথা এগুলো বরং ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

বিরোধী মতামতের প্রতি অসহিষ্ণুতাঃ

এরশাদ সরকার ছিল বিরোধী মতামতের প্রতি নিতান্তই অসহিষ্ণু। বিরোধী দল ও জোটসমূহের প্রতি এ সরকার বরাবরই আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করতেন। বিরোধী দল ও জোটসমূহ কর্তৃক আহুত জনসভার উপর সরকারী দলের নগ্ন হামলা ছিল নিত্য দিনের ঘটনা। বিরোধী দলীয় প্রতিবাদ মিছিলের উপর সরকারী দলীয় মদদপুষ্ট গুন্ডাবাহিনীর সশস্ত্র হামলার ফলে অসংখ্য নেতা ও কর্মী আহন হন। যে কোন বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এরশাদ স্বীয় মতকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁর এ ধরনের অগণতান্ত্রিক আচরণ অনেক রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসকের মনে চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। এভাবে তিনি গনতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন।

স্থানীয় পর্যায়ে ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার প্রবর্তনঃ

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এরশাদ সরকার প্রবর্তিত উপজেলা ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ ছিল জনগণ নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানের উপর সরকার নিয়োগকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও.) যিনি ছিলেন একজন সরকারী আমলা। তাঁর অযাচিত হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ। ফলে একজন জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্বেও উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থার কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হননি। এতে করে উপজেলা ব্যবস্থা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণকেই সুদৃঢ় করে তুলেছিল। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করার যে লক্ষ্য নিয়ে উপজেলা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তা আর বাস্তবায়ন হয়নি। প্রশাসনের সাথে জনবিচ্ছিন্নতা এভাবে অধিকতর প্রকট হয়ে উঠে।

বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে জাতীয় লুণ্ঠনঃ

বাংলাদেশে মুজিব শাসনামলে দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ক্ষমতাসীন সরকার বৃহৎ শিল্প ও কলকারখানা জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ করেন। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান সরকার এ জাতীয়করণ নীতির পরিবর্তে ধীরেধীরে বিরাষ্ট্রীকরণ বা বিজাতীয়করণ চালু করেন। কিন্তু এরশাদ সরকার বেশ কিছু জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাংক, বীমা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান নামমাত্র মূল্যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে বিক্রি করে দেন। এতে করে কতিপয় নব্য কোটিপতি সৃষ্টি হয়। এর সুবিধা রাষ্ট্রপতি এরশাদ নিজেও তার কতিপয় অনুযোগী সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন।

হ্রাসকৃত উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিঃ

এরশাদ সরকারের আমলে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে মোট উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাসপায়। উপকরণের লাগামহীন মূল্যের প্রেক্ষাপটে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে কালো টাকার ছড়াছড়িতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি এক ব্যাপক আকার ধারণ করে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ফলশ্রুতিতে জনগণ হয়ে পড়ে দিশেহারা। এর পাশাপাশি প্রতি বছরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। আবার কৃষি উপকরণের ব্যক্তিকরণ ও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন কানুন পাসের ফলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে নেমে আসে এক প্রগাঢ় কালো ছায়া। এর বিপরীতে স্বল্প সংখ্যাক ব্যক্তির হাতে সকল সম্পদ স্তুপীকৃত হয়।

বৈদেশিক ঋণের উপর অত্যধিক নির্ভরতাঃ

দীর্ঘ নয় বছরের শাসনকালে প্রতি বছরই বার্ষিক বাজেটে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যেই বৈদেশিক সাহায্যের উপর সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এক হিসাবে দেখা যায় যে, এ বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ সামরিক ও বেসামরিক আমলা, একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ, অসাধু ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিদের জন্য ব্যয়িত হয়। ১৯৯০-৯১ সালে সরকারের রাজস্ব ব্যয় দেখানো হয় ৭,৩০০ কোটি টাকা। সামরিক, আধা সামরিক এবং সাধারণ প্রশাসন ক্ষেত্রে এ অর্থ অধিক মাত্রায় ব্যয় করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা দেশগুলো বাংলাদেশের মত একটি দেশে এ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধিতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে।

আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতিঃ

এরশাদের শাসনকালে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানী, ছিনতাই প্রভৃতি অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রকট আকার ধারন করে। সমগ্র দেশব্যাপী শহরে বন্দরে, ব্যবসা কেন্দ্রে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

দূর্নীতির ব্যাপক প্রসারঃ

এরশাদ শাসনামলে দেশ যদিও এক সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয় তবুও রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও তার পত্নি রওশন এরশাদ এবং মন্ত্রীদের ঘিরে থাকা এক ক্ষুদ্র অশুভ চক্র অতিদ্রুত তাদের ভাগ্যে পরিবর্তন করে দেয়। ঢাকা ভিত্তিক উন্নয়নের নামে তাঁরা দূর্নীতির পাহাড় গড়ে তোলেন। ঢাকা শহরে এখানে ওখানে বিভিন্ন মার্কেট নির্মাণ, পান্থপথ, রোকেয়া সরণী, বিজয় স্বরণী ইত্যাদি নির্মাণ করে তিলোত্তমা ঢাকা বানাবার পেছনে মূলতঃ কমিশন হিসেবে কোটি কোটি অর্থ-সম্পদ উপার্জন করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। তাছাড়া সোডিয়াম লাইট লাগানোর ক্ষেত্রেও ব্যাপক দূর্নীতি ধরা পড়ে। রাষ্ট্রপতির বিশেষ তহবিল, ফার্স্ট লেডির তহবিল, ত্রাণ তহবিল, পথকলি ট্রাস্ট তহবিলের হিসাব কখনো প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু দেশে বিদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁদের দূর্নীতির কাহিনী প্রকাশিত হয়। শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের দূর্নীতি ও পুনর্গঠনের সংবাদ জনজীবনে হতাশার সৃষ্টি করে। এ হতাশা থেকে জন্ম নেয় প্রতিশোধের আগুন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হয়না। দুর্নীতি করে এরশাদ গণতান্ত্রিক সংকট সৃস্টি করেছেন।

ব্যক্তিগত চারিত্রিক ত্রুটিঃ

এরশাদ যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ ও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়। এসব অধ্যায়ের কোনটিই ভিত্তিহীন ছিল না। এরশাদ-মেরী কেচ্ছা, এরশাদ-জিনাত উপাখ্যান এদেশে কারো অজানা নয়। এসব রুচিহীন কাহিনী জনমনে ঘৃণার উদ্রেক করে। দেশের প্রেসিডেন্ট তথা প্রধান শাসকের ব্যক্তি চরিত্রের অধঃপতনজনিত ঘটনাবলী জনগনের কাছে ভাবমুর্তির বিরাট শুন্যতা সৃস্টি করে। প্রশাসক হিসেবে এরশাদের গ্রহনযোগ্যতা কে তলানীতে নিয়ে যায়। যাহা এদেশে বিরাট আস্থার সংকট তৈরী করে।

ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারঃ

রাষ্ট্রপতি এরশাদ ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি দেশের অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কোণঠাসা করে ফেলেন। ইসলাম যদি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির ধর্ম তথাপি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ একে তাঁদের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর চরম আঘাত বলে মনে করেন। এর ফলে দেশে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব উৎকট হয়ে উঠে। সংখ্যাগুরু তোষনের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে নিস্কন্টক করার মাধমে দেশে গণতান্ত্রিক সংকট তৈরী করেন।

সামাজিক ভারসাম্যহীনতাঃ এরশাদ সরকারের আমলে সমাজে এক ধরনের ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। কালো টাকার অঢেল সম্পদের মালিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিরাট ব্যবধান ও বৈষম্য। [৪৪]

৪.৫ উপসংহারঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এরশাদের মত এত দীর্ঘ সময় শাসন ক্ষমতায় আর কোন শাসক অধিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। দীর্ঘ নয় বৎসর কাল ক্ষমতাসীন থাকার সময়ে জেনারেল এরশাদ বিভিন্ন পদক্ষে ও কৌশল অবলম্বন করে তাঁর প্রবর্তিত সামরিক শাসনকে বেসরমরিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরশাদ শাসনামলের দীর্ঘ সময়ে তিনি জনমর্থন আদায়ের জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করলেও নানা কারণে জনগণের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন কদাচিত লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে এরশাদের প্রদত্ত নির্বাচনসমূহ জনগণের কাছে কখনও অবাধ, নিরপক্ষে, সুষ্ঠু নির্বাচন হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ব্যক্তিগতভাবে এরশাদের সততা, বিশ্বস্ততা ও দেশপ্রেম সব সময়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে এরশাদের আমলে বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনের সন্ত্রাস। ভোট ডাকাতির ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিছক প্রহসনে পরিণত হয়েছে বিধায় তা জনগণের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হয়নি। এরশাদের দীর্ঘ নয় বৎসরের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির এক এবং জোটবদ্ধ সংগ্রামের ফলে গনঅভ্যূত্থান সংঘটিত হয় এবং **১৯৯০** এর ডিসেম্বরে এরশাদ ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তখন থেকে আর এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।[৪৫]

পাদটিকাঃ

1. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর, ঢাকা,১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ১৯৯১ পৃঃ -২।
2. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ: ২৫৮-২৫৯।
3. মোস্তফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, প্রাগুক্ত, পৃঃ -৭।
4. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, প্রাগুক্ত, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃঃ -৮৬।
5. মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৯-৬০, দৈনিক ইত্তেফাক,
6. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ -১১৯-১২০।
7. শওকতআরা হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংখ্যা ১৯৯২, পৃঃ -৩৬।
8. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত (সম্পাদনায়) নব্বই এর অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ৩৫
9. ডঃ হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃঃ -৩৬২-৩৬৪।
10. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ -১৭৩।
11. দৈনিক সংগ্রাম , ঢাকা, ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬,
12. দৈনিক বাংলা , ঢাকা,২১ অক্টোবর, ১৯৮৬, ২১ অক্টোবর।
13. আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, ঢাকা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৬, পৃঃ -১৭৭।
14. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর, ঢাকা,১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ১৯৯১ পৃঃ -৭৭।
15. ডঃ হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশের জন-প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের ক্রমবিকাশ, ঢাকা, হাসিনা প্রকাশনী, পৃঃ -৩৪১।
16. ডঃ হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ -৩৪২,
17. ডঃ হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ -৩৬১-৩৬২,
18. অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আবদুল অদুদভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলাবাজার, পৃ: ৫৫১-৫৫৫।

19. Government of Bangladesh, Tables of organization and E 2 reprint: Ministries, Constitutional Bodies, Commissions etc. Dhaka-1982
20. সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তালিকা, ১৯৯০
21. হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণঃ, ঢাকাঃইউপিএল, ,১৯৯২ পৃঃ -১০১
22. হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরনঃ, ঢাকাঃইউপিএল, ১৯৯২ পৃঃ -১০২
23. একতা ১৫-০৮-১৯৮৯
24. হাসানুজ্জামান, সামরিক রাজনীতির চালচিত্র: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকাঃআহম্মদপাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩, পৃঃ ২৩-২৯
25. হাসানুজ্জামান, সামরিক রাজনীতির চালচিত্র: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকাঃআহম্মদপাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৪-৩৭
26. গোপন সার্কুলার নং-১।এ প্রচারপত্রটি ৩ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে ঢাকা মহানগরীতে জনগণের কাছে বিলি করা হয়।
27. সংবাদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক অজানা কাহিনী , ০৩-০১-১৯৯১
28. একতা ০৮-০৫-১৯৮৯
29. পূর্বাভাস (সাপ্তাহিক পত্রিকা) ঢাকাঃ, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৩, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০
30. মুনতাসিরমামুন, জয়ন্ত-কুমার রায় বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা। ১৯৯৫, ঢাকা ১৪৩।
31. একশন কমিটি ফর সিভিল রুল, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হউন ২৭-১০-১৯৯০
32. একতা ৫-১০-১৯৮৮
33. হাসানুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২
34. নাজিমুদ্দিন মোস্তান, "প্রভুর সংগে বিদায়" বাংলাদেশের স্পয়েল সিস্টেমের প্রবর্তক এরশাদ, ঢাকাঃ, সাপ্তাহিক খবরের কাগজ ২০, ডিসেম্বর- ১৯৯০, পৃষ্ঠা-২১
35. মাহমুদ শফিক, মিডম্যানআমলাতন্ত্রের বিস্তার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা আগস্ট ২১, ১৯৮৭
36. এমাজুদ্দিন আহমেদ, প্রগুপ্ত, পৃষ্ঠা ৬৪।
37. মুনতাসির মামুন, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৬৪।
38. দৈনিক সংবাদ, ২০ জুন ১৯৯১।
39. উদ্ধৃতি, মুজিবুল হক, সংস্কৃতি বিন্যাসি স্বৈরাচার অভ্যুত্থান, পৃষ্ঠা১৩৫।
40. অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আবদুল অদুদভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলাবাজার, পৃ: ৫৫০-৫৫৫।
41. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ: ২৪৮।

পঞ্চম অধ্যায়

এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন

৫.১ সুচনাঃ

এরশাদ তার দীর্ঘ প্রায় ৯ বছরের শাসনামলের পুরো সময় প্রবল গণআন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, সাংবাদিক, বেতার-টেলিভিশন শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, মহিলা, কৃষক, শ্রমিক-কর্মচারী প্রভৃতি শ্রেণী পেশার জনগণ শামিল হয়। গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এরশাদ বিরোধী বিভিন্ন জোট এবং শ্রেণী ও পেশাজীবীদের মধ্যে আন্দোলনের নতুন নতুন সংস্থা। এদের মধ্যে, ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে গঠিত ১৫ দলীয় ঐক্যজোট (১৯৮৬ সালের ৭মে'র সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে যা বিভক্ত হয়ে ৮ দল ও ৫ দলের সৃষ্টি হয়), বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (১৯৮৩), আন্দোলনের শেষের দিকে গঠিত ২২টি ছাত্র সংগঠন (যার মধ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অন্তর্ভূক্ত হয়), শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ, ১৭টি কৃষক সংগঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক পর্যায়ে প্রণীত হয় ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের যৌথ ৫ দফা আন্দোলনের কর্মসূচি (অক্টোবর ১৯৮৩)। এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে যুগপৎ আন্দোলন। ৫ দফা কর্মসূচির মূল দাবি ছিল অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং যে কোন নির্বাচনের আগে সার্বভৌমত্ব জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান। রাজনৈতিক দল ও জোটের আহবানে শুরু হয় অর্ধদিবস, পূর্ণদিবস, ২৪ ঘন্টা, ৩৬ ঘন্টা, ৪৮ ঘন্টা, ৭২ ঘন্টার হরতাল ও অবরোধ। এরশাদ শাসনের অধিকাংশ সময় তা বারংবার ঘটে। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর বুকে ও পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' লেখা সহ ঢাকার জিপিও সংলগ্ন জিরো পয়েন্টে পুলিশের গুলিতে নুর হোসেন নিহত হলে, তা জনগণের চেতনামূলে নাড়া দেয়।

বিরোধী দলের উপর্যুপরি আন্দোলন ও কর্মসূচি ঘোষণার ফলে এরশাদ বারবার পিছু হটতে বাধ্য হন। বিভিন্ন নির্বাচনের তারিখ একাধিকবার ঘোষণা এবং পরে তা বন্ধ বা পরিবর্তন, একাধিকবার জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও প্রত্যাহার, বিভিন্ন সরকারিনীতি বা পদক্ষেপ ঘোষণার পর তা প্রত্যাহার করে নিতে তাকে দেখা যায়।

১৯৯০ সালের নভেম্বর মাস থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা পায় এবং দ্রুত তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। এর মূলে ছিল, তিন জোট (৮ দল, ৭ দল, ৫ দল) কর্তৃক ১৯ নভেম্বর সংবিধানের আওতায় এরশাদ ও তার সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মূলাসহ একটি যৌথ ঘোষণা জাতির সম্মুখে উপস্থাপন, যা তিন জোটের রূপরেখা' নামে খ্যাত। ১৭ নভেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যায় ঢাকার মন্ত্রিপাড়া এবং সারাদেশে এরশাদ সরকারের দুর্নীতিবাজ এমপিদের বাসাবাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি। ২৭ নভেম্বর বিএমএ (বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন) আহুত দেশব্যাপী চিকিৎসক ধর্মঘটের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মোড়ে এরশাদের ঘাতক বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণ হারান

বিএমএ নেতা ডা: সামসুল আলম মিলন। এ হত্যাকান্ড এরশাদবিরোধি আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। ২৭ নভেম্বর রাতে সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং ঢাকা শহরে কার্ফু জারি করে। এসব উপেক্ষা করে জনগণ ও সংগ্রামী ছাত্র সমাজ আন্দোলনকে আরো তীব্র করে তুলে। ২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সবাই আন্দোলনের সমর্থনে একাযোগে পদত্যাগ করেন। এরপর এক এক করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দও পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সংঘটিত হয় এরশাদ বিরোধী '৯০ এর গণঅভ্যূত্থান। ৪ ডিসেম্বর এরশাদ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। ৬ ডিসেম্বর তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত নিরপক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে, এরশাদের দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটে।[১]

৫.২ এরশাদের পতন ও এর কারণঃ

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ কর্তৃক অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। ফলে ক্ষমতা দখলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এরশাদ জনগণের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এরশাদ সরকারের গৃহিত প্রতিটি পদক্ষেপই এরশাদকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে।

১৯৯০ সালে শেষের দিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে। সরকারের দীর্ঘদিনের অনাচার, দুর্নীতি, ১৯৯০ এর প্রারম্ভ থেকেই দেশে প্রবল অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। নিজের ক্ষমতার অবস্থান দৃঢ় রাখার লক্ষ্যে এরশাদ অন্যান্য সকল উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করে সামরিক বাহিনী ও প্রতিরক্ষার খাতে ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এ বিষয়টি জনমতে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তা'ছাড়া আমদানি ব্যবসায় দুর্নীতি, বিদেশে সম্পদপাচার এবং ঘুষ ও চুরির ভাগাভাগি বৃদ্ধির জন্য অস্বাভাবিক হারে বিভিন্ন প্রকল্প খরচ বৃদ্ধি, এবং বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, আয়ের তুলনায় ব্যয়ের বাহুল্য, আর অন্যদিকে মূলধনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় দেশের গোটা অর্থনীতি হুমকির সম্মুখীন হয়। সরকারের চরম অনিয়ম, দুর্নীতি অদক্ষতা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার নানা রকম ত্রুটিবিচ্যুতি সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মূল্যমানে বিকৃতি দেখা দেয় এবং বিনিয়োগ ক্ষেত্রে দারুন মন্দা দেখা দেয়। ১৯৯০ এর এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সাহায্য সংস্থার বার্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ দাতাগোষ্ঠির নানা ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। অবৈধ সরকারের চরম স্বেচ্ছাচারিতা, দায়বদ্ধতাহীনতা, অস্বচ্ছতা, সর্বোপরি দেশ ও জনগণের কাছে অবিশ্বস্ততা দেশের অর্থনৈতি ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী সে বিষয় সন্দেহের আর অবকাশ থাকলোনা। এরূপ সংকটময় পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রীকে পদচ্যুত করানো এবং পরিকল্পনামন্ত্রীর পদত্যাগ সংকটকে আরো ঘণীভূত করে তোলে।ইতিমধ্যে ইরাকের কুয়েত দখলের ঘটনার পরবর্তী সময়ে পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাব গোটা জাতির উপর সংকটের ছায়া ফেলে। পরবর্তীতে কুয়েত ও ইরানে চাকুরিরত ব্যক্তিগত চাকুরিচ্যুত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে দেশের অর্থনীতিতে প্রবল সংকট সৃষ্টি হয়। প্রায় ১ লক্ষ বাংলাদেশী গৃহহীন ও বেকার হয়ে সমাজের বোঝারুপে অবস্থান করে। একদিকে মানুষের আয় সংকুচিত হয় ব্যয় বৃদ্ধি পায় কারণ দ্রব্যমূল্য লাগামহীন গতিতে বেড়ে চলায় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সঙ্কুচিত হতে থাকে। ফলে ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২]

যেসব কারণে এরশাদের পতন ঘটে তা এরূপ-

(ক) একটি নির্বাচিত সরকারকে মাত্র ১২৮ দিনের মাথায় ক্ষমতাচ্যুত করে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল।

(খ) বিভিন্ন নির্বাচন (গণভোট, স্থানীয় সংস্থা, উপজেলা, জাতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতি) অনুষ্ঠান এবং কোনো ক্ষেত্রে তা একাধিকবার করা সত্ত্বেও বৈধতা অর্জনে ব্যর্থতা।

(গ) সন্ত্রাস ও কারচুপির আশ্রয় নিয়ে ভোটারবিহীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থাসহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মুল্যবোধ যা কিছু ছিল তার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন এবং এর ফলে জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি।

(ঘ) সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির ফলে জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা ।

(ঙ) দলীয় নেতা, মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সামরিক বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী, নিকট আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দুর্নীতির প্রসার।

(চ) প্রশাসনের সামরিকীকবরণ।

(ছ) এরশাদের চারিত্রিক স্খলন ও অবাধ লাম্পট্য।

(জ) বাংলাদেশের সর্বস্তরের শ্রেণী পেশার জনগণের সর্বাত্মক বিরোধীতা এবং

(ঝ) এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সেনাবাহিনীর সমর্থন প্রত্যাহার ইত্যাদি।[৩]

৫.৩ এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল-

১. স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

২. গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা।

৩. জাতীয় সংসদকে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌম সংসদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

৪. দেশে সত্যিকার অর্থে জবাবদিহীতামূলক তথা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

৫. দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠা করা।

৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা এবং সেই স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো ছিল গণঅভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য। সীমাহীন দুর্নীতি ও সামাজিক অবক্ষয় রোধকল্পে মূল্যবোধ, ঐতিহ্যকে লালন করা ছিল এর অপর একটি উদ্দেশ্য। নির্বাচনের মত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল কিভাবে এরশাদ শাসনামলে সরকার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে নির্বাচনকে 'প্রহসনে' পরিণত করেছিল। নির্বাচন এর বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, জনগণ এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য গণঅভ্যুত্থানে শরীক হয়। এরশাদ শাসনামলে জাতীয় সংসদ এর সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিল। সরকারী দলের স্বৈরাচারী কর্মকান্ডের ফলে বিরোধীদল অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তারা অবশেষে সংসদ বর্জন করতে বাধ্য হয়। সরকারী মদদপুস্ট হয়ে আ.স.ম আবদুর রবের নেতৃত্বে কতিপয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত বিরোধী দল' হিসেবে সংসদে আবির্ভূত হয়। তারা সরকারের গৃহপালিত বিরোধী দলের নেতা হিসেবে আখ্যা লাভ করেন। স্বভাবতই জাতীয় সংসদ নামমাত্র আইনসভায়' পরিণত হয়। জাতীয় সংসদ মূলত: রাবারস্ট্যাম্প' এ পরিণত হয়।

এছাড়া ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের আরো একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারের এবং সেই সাথে জবাবদিহি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের নামে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে কিভাবে এরশাদ সরকার সুদীর্ঘ নয় বছর স্বৈরাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে ছিল দেশবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছিল। কাজেই ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান স্বৈরাচার ও অত্যাচার নিপীড়নের সব দুর্গ বিনষ্ট করে দিয়ে সংসদীয় জবাবদিহিতা মূলক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে জনগণের কাছে অঙ্গীকার করে। আর বাস্তবে হয়েও ছিল তাই। রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের সেই অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিল। [৪]

৫.৪ এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনঃ

এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

শিক্ষা আন্দোলনঃ

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৬ মে ড. আবদুল মজিদ খানকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তার মাধ্যমে শিক্ষানীতিকে পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা চালান। ২৩ সে (১৯৮২) মজিদ খান শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। মজিদ খানের শিক্ষানীতি ঘোষণার পর পরই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থকে শ্লোগান ওঠে মজিদ খানের শিক্ষানীতি 'মানি না মানব না' শুধু ছাত্ররাই নয় এদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পক্ষ থেকেই তুখোড় সমালোচনা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মজিদ খানের শিক্ষানীতি গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।[৫]

১৪টি ছাত্র সংগঠন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। ১৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ২১ নভেম্বর ১৯৮২ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও সাংবাদিক সম্মেলন করেন।[৬]

রাজনৈতিক দলসমূহের আন্দোলন ও কর্মসূচী:

১৯৮৩ সালের ৩১ জানুয়ারী ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানকে কটাক্ষ করে এরশাদের দেয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ১৫টি রাজনৈতিক দলের নেতারা এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন। এরশাদ শাসনামলে এই প্রথম রাজনৈতিক দলগুলি অগ্রসর হয়। এই ১৫টি রাজনৈতিক দল নিয়েই পরবর্তীকালে ১৫ দলীয় জোট গঠিত হয়। এ দলগুলো ১৫ দলের জোটে শরিক হয়।

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (সভানেত্রী শেখ হাসিনা)

২. গণআজাদী লীগ (সভাপতি)- মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

৩. আওয়ামী লীগ (মিজান) সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী

৪. আওয়ামী লীগ(ফরিদ গাজী) সভাপতি-দেওয়ান ফরিদ গাজী

৫. বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সভাপতি ন্যামনসিংহ)

৬. ন্যাপ (মোজাফ্ফর সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহম্মেদ)

৭. ন্যাপ (হারুন/সভাপতি-চৌধুরী হারুন রশীদ)

৮. জাতীয় একতা পার্টি (সভাপতি সৈয়দ আলতাফ হোসেন)

৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি মেজর অব. এম এ জলিল)

১০. ওয়াকার্স পাটি

১১. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল

১২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া)

১৩. সাম্যবাদী দল (তেয়াহা)

১৪. সাম্যবাদী দল (নগেন)

১৫. মজদুর পার্টি (আবুল বাশার)।

পাশপাশি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (কাজী জাফর), বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট লীগ, আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ প্রমুখ দল নিচে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী এরশাদ সরকারের বিতর্কিত শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। ওই দিন একটি ছাত্র মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল পেরিয়ে শিক্ষাভবনের নিকট পৌঁছলে সেখানে মোতায়েনকৃত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর লোকেরা ছাত্রছাত্রীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জসহ এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এতে অনেক ছাত্রছাত্রীর হতাহতের খবর পাওয়া যায়। অতঃপর দুপুরে এক সরকারি ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এরশাদের ক্ষমতা দখলের এক বছর পর ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জোটের সৃষ্টি। একটি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট আর একটি বিএনপি নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট এ ২টি জোট ও অন্যান্য ছোট ছোট দলগুলো সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্রের পুন: প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ দফা দাবি পেশ করে।

৫ দফা দাবি নিম্নরূপঃ

১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।

২. অবিলম্বে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুণ: প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার সব বিধি নিষেধ তুলে নিতে হবে।

৩. দেশে যেকোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে আগামী শীত মৌসুমের মধ্যেই সার্বভৌম জাতীয় সংসদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সব বিষয় জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। সংবিধান সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে, অন্য কারও নয়।

৪, রাজনৈতিক কারণে আটক, বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সব রাজনৈতিক নেতা ও কমিটিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সব রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৫. মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্র হত্যার তদন্ত বিচার ও দোষীদের শাস্তি এবং নিহত ও আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১৯৮৩ সালের এ ঘোষণার পর দেশে ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে ১৫ ও ৭ দলের জোটসমূহে ৫ দফা আদায়ের আন্দোলনে ছাত্ররা মাঠে নামে। এদিকে জেনারেল এরশাদ ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের পর তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৫ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে গণবিক্ষোভ পালনকালে অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের সব শিক্ষা প্রতিষ্টান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সেদিন রাতেই আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা, বেগম সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ড. কামাল হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু, আবদুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, মোহাম্মদ নাসিম ও ডা. এম এ মালেকসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৮৩ এর ১ মার্চ তারিখে সামরিক সরকার দেশে রাজনৈতিক আলোচনার অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতাসহ অন্যান্য গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিদান করে।

২৫ মার্চ ১৯৮৩ তারিখে মেজর জেনারেল এরশাদ কর্তৃক এক রেডিও টিভি ভাষণে ঘোষণা করা হলো ১ এপ্রিল ১৯৮৩ হতে দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করা হবে।

১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার ছাত্রসহ আটক সবাইকে ২৬ মার্চ উপলক্ষে শুভেচ্ছা স্বরূপ মুক্তিদান করা হয়। মূলত সামরিক সরকার দেশের রাজনৈতিক আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতাসহ অন্যান্য গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিদান করে।

১ এপ্রিল ১৯৮৩ থেকে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ঘরোয়া রাজনীতি অনুমোদিত হয় এবং জেনারেল এরশাদ কর্তৃক বিরোধী দলীয় নেতাদের দেশর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়ে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

২ এপ্রিল বিএনপির বহুল আলোচিত তলবি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সাত্তার ও বদরুদ্দোজা বিএনপি থেকে বহিষ্কার হন। তলবি সভায় সামশুদ্দিন হুদা চেয়ারম্যান ও ড. মতিন মহাসচিব নির্বাচিত হন। [৯]

৪ এপ্রিল মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীসের সভাপতিত্বে গণআজাদী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর আরোপিত সব বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারির হতাহতের তালিকা প্রকাশ, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়।

৬ এপ্রিল সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৫ দলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৯ এপ্রিল দাবি দিবস পালনের প্রস্তুতি হিসেবে।

২৮ এপ্রিল এরশাদের সঙ্গে জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খানের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১০]

জুন মাসের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ বাড়িতে আওয়ামী লীগের ২ দিন ব্যাপী বর্ধিত সভা শুরু হয়। জুন মাসেই আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলীয় ঐকাজোট ৯ দফা দাবিসম্বলিত কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন এবং অনতিবিলম্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। একই সঙ্গে বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত ৭ দলীয় জোট তাদের দাবি ঘোষণা করেন। তাদের দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সেনাপ্রধান ও সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের এক ইফতার পার্টিতে দাওয়াত করেন। এ দাওয়াত ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের নেতারা প্রত্যাখ্যান করলেও বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা যোগাদান করেন। ১৯৮৩ সালের ৮ জুলাই সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জে. এরশাদ এক রেডিও ও টিভি ভাষণে নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করেন।

২ আগষ্ট মহিউদ্দিন আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাকসহ ৬ জনকে আওয়ামীলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তথাপি ১৯৮৩ সালের ৬ সেপ্টম্বর ২টি ভিন্ন মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয়। ৫ দফার অভিন্ন কর্মসূচি। ১৫ ৫.৭ দলে আয়োজিত সেই সভা থেকে শুরু হয় সরকার বিরোধী আন্দোলন। ২২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনীতি বাকশালকে পুনরুজ্জীবিত করেন মহিউদ্দিন আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাক। [১১]

১৯৮৩ সালের ১ নভেম্বর ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের আহবানে দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৪ নভেম্বর জেনারেল এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রকাশ্যে রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় এবং প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। [১২]

কেউ কেউ এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন। অবশ্য বড় দলগুলো বলেছে, সামরিক শাসনের অধীনে কোনো নির্বাচন মেনে নেয়া হবে না।

১৬ নভেম্বর ১৫ দলের জনসভায় নেতারা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সর্বাগ্রে সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্বাচনসহ ৫ দফা মেনে নেয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, ব্যতিক্রম কোন কিছু মেনে নেয়া হবে না।

২২ নভেম্বর ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ২৮ নভেম্বর ১৯৮৩, ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের যৌথ আহবানে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। হাজার হাজার নেতাকর্মী এবং জনগণের সঙ্গে সচিবালয়ের দুপাশে অবস্থান নেন শেখ হাসিনাও বেগম খালেদা জিয়া। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ব্যক্ত করে এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। এই অবস্থান ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সেদিন ঢাকায় সংঘটিত হয় ব্যাপক উত্তেজনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা। অতঃপর রাতে এক রেডিও টিভির ঘোষণায় সারা দেশে সব প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা পুণরায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া সারা ঢাকায় পুণরায় সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়। এই রাতেই বেগম খালেদা জিয়া ও

শেখ হাসিনাকে যথাক্রমে ক্যান্টেনমেন্টস্থ এ মহাখালী বাসস্থান রাখা হয়। এছাড়া এ অবস্থান ধর্মঘটের সময়ও ওইদিন রাতে অনেক নেতাকর্মী ও সাধারণ লোককে গ্রেফতার করা হয়।[১৩]

জেনারেল এরশাদ স্বয়ং তার পূর্ববর্তী সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণে ১৯৮৩ সালে নভেম্বর মাসের শেষের দিনে 'জনবল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন ।

১১ ডিসেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৪]

১৪ ডিসেম্বর (১৯৮৩) ২২ ও ২৮ নভেম্বরের ঘটনার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাগুলো প্রত্যাহারসহ ওই দিবসদ্বয়ে, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি প্রদান করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ তারিখে বিরোধী দলগুলোর মতামতের তোয়াক্কা না করে দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু করেন এরশাদ। রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত আন্দোলনের মুখে ১৯৮৩ সালে নভেম্বর মাসে অবাধ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর থেকে সব প্রকার নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়া হয়। এ সময় থেকে রাজনৈতিক দলগুলো মূলত দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এ পর্যায়ে সরকারের ঠান্ডা ও গরম নীতির কারণে সব প্রধান রাজনৈতিক দলে বড় ধরনের ভাঙ্গন এবং ব্যাঙের ছাতার মতো নতুন রাজনৈতিক দলে উত্থানের ঘটনা ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে বিরোধী দলগুলি সরকার বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্য এ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নেয়। ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট গড়ে। যা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৮৪ সালের ২ জানুয়ারি ছিল সারাদেশে পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের দিন। ৭ জানুয়ারি ১৯৮৪ সামরিক সরকার দেশে পুনরায় ঘরোয়া রাজনীতির অনুমোদন দেয়। ওইদিনই ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটের বাহিরে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা এরশাদ কর্তৃক আহুত রাজনৈতিক সংলাপের অংশ হিসাবে বঙ্গভবনে তার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। ১০ জানুয়ারি ১৯৮৪ দেশ ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষকাল ব্যাপী নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

১২ জানুয়ারি ১৯৮৪ বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন মনোনীত হন।[১৫]

২৭ জানুয়ারি ১৫ ও ১৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয় উপজেলা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ফেব্রুয়ারি ছিল উপজেলা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ নওয়াবপুর রোডে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের একটি মিছিলের ওপর পুলিশ গাড়ি চাপিয়ে দিয়ে তার আঘাতে এবং চাকার নিচে পিষ্ঠ হয়ে দুজন ছাত্র ঘটনাস্থলেই প্রাণহারায় এবং অনেক ছাত্র আহত হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারী সামরিক সরকার ঘোষনা করে, ২৬ মার্চ ১৯৮৪ থেকে অবাধ রাজনীতির এবং ২৭ মে ১৯৮৪ তারিখে একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত। ১ মার্চ ১৯৮৪ ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের আহবানে সারা দেশব্যাপী পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। এতে একজন নিহত হয়। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এদিনে পরবর্তী কর্মসূচির মধ্যে ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচনের দিন কালো দিবস' পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ১ মার্চের হরতালে বিভিন্ন

নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১ মার্চের পূর্বরাতে হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে অন্তরীন করা হয় এবং ৫ই মার্চ তাদের মুক্ত করা হয়। ৩ মার্চ ১৯৮৪ তারিখে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহবান জানায় উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের। ৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচনে ৭ শতাধিক প্রার্থী তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। ১৯৮৪এর ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহে এরশাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে আন্দোলনে জনগন একাকার হয়ে পড়ে। ১৮ মার্চ ১৯৮৪ সামরিক সরকার উপজেলা নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে ২১ তারিখের অন্যান্য কর্মসূচি বহাল রাখে। ২৪ মার্চ সামরিক সরকার দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পুনরায় সংলাপ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[১৬]

মার্চে সরকার সমর্থক একটি ১৫ দলীয় জোট জন্মলাভ করে। নবগঠিত জোটের সদস্য দলগুলি হল মুসলিম লীগ (টি. আলী), বিএনপি (দুদু-নিলু) বাংলাদেশে ইউনাইটেড ন্যাশনালিস্ট পার্টি, জনদল, ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদ নেজামে ইসলামী পার্টি। মার্চের শেষের দিকে সামরিক সরকার পুনরায় দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে অংশ নেয়ার আহবান জানায়। আওয়ামী লীগ বিএনপি ৫ দফার ভিত্তিতে সরকারের সঙ্গে সংলাপে যেতে রাজি হয়।

১ এপ্রিল ১৯৮৪ এক সমাবেশে খালেদা জিয়া বলেন, সংলাপ আপস নহে সংগ্রামেরই অংশ। ২ এপ্রিল বায়তুল মোকারম প্রাঙ্গনে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় বক্তৃতাকালে জামায়েতে ইসলামীর অস্থায়ী আমির মাওলানা আব্বাস আলি খান ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক গঠনের দাবি জানায়।[১৭]

উল্লেখ্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে প্রস্তাব জামায়াত কর্তৃক উত্থাপিত হল তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মায় ওই দেশের বিরোধী দল ১৯৫৮ সালে উত্থাপন করেছিলেন। অতঃপর সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ শুরু হয়।

৯ এপ্রিল ১৯৮৪ বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের ২০ সদস্য বঙ্গভবনে সংলাপের উদ্দেশ্য যান। পরে তারা ৩৩ দফা দাবিনামা পেশ করেই বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। ১০ এপ্রিল ১৯৮৪ জামায়াতের সঙ্গে সরকারের সংলাপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১১ এপ্রিল ১৯৮৪ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় ৩৮ নেতা বঙ্গভবনে আলোচনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। এদিন ৩ ঘন্টা আলোচনা হয়। এক পর্যায়ে বাক বিতন্ডা শুরু হলে আলোচনা মূলতবী ঘোষনা করা হয়।

১২ এপ্রিল ১৯৮৪ বঙ্গভবনে এরশাদের সঙ্গে খালেদা জিয়ার একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ এপ্রিল ১৫ দলীয় জোটের সঙ্গে ২ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২০ এপ্রিল ৭ দলীয় জোটের তৃতীয় দফা বৈঠক হয়।

২৮ এপ্রিল ১৯৮৪ এরশাদ সরকারের সঙ্গে মোশতাকের নেতৃত্বাধীন কয়েকটি ডানপন্থী দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ দলের ৩০ এপ্রিলের ১৯৮৪ বৈঠকে সার্বভৌম সাংসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায় এবং আর আলোচনার অবকাশ সরকারের সঙ্গে নেই বলে নেতারা বলেন।

১ মে ১৯৮৪ মোশতাকের জনসভায় ৩ দফা বোমা হামলা হয় এবং একজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়।

এছাড়া ১ মে ১৯৮৪ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে পর পর ৪টি বোমা বিস্ফোরিত হয়।

এর প্রতিবাদে ৫ মে ১৯৮৪ দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল আহবান করা হয়। বিএনপি ৫ দফার দাবিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানায়। ১৫ দল প্রেসিডেন্টের ভাষনের প্রতিবাদে ১৯ মে সমাবেশ ও বিক্ষোভের কর্মসূচি দেয়।

২০মে ১৯৮৪, ১৫ ও ৭ দল এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ কর্মসূচী দেয়। [১৮]

শ্রমিক কর্মচারী পরিষদের আহত ২২ ও ২৩ মের ১৯৮৪ ধর্মঘটের প্রতি বিএনপি ৭ দলীয় জোট সমর্থন জানায়। ও ঐক্য পরিষদের সঙ্গে ২১ মে ১৯৮৪ চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। ২৬ মে ছাত্রসংবাদ পরিষদ প্রতিবাদ দিবস পালন করেন এবং ৭ ও ১৫ দল রমজান পরবর্তী জোরালো আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। [১৯]

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকিতে সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবি জানানো হয়। ৫ জুন ১৯৮৪ ১৫ দলের মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং ওই সমাবেশে এরশাদ বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

৯ জুলাই ১৯৮৪ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ও হাসিনার অন্যতম পরামর্শদাতা এম কোরবান আলী এরশাদের মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করেন।

১২ জুলাই ১৯৮৪ সামরিক সরকার ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তারিখে কেবলমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৩০ জুলাই ১৯৮৪ বিএনপির অন্যতম প্রধান ও বিপ্লবী নেতা ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী এরশাদের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ২ নেতা সামরিক জান্তার মন্ত্রিপরিষদে যোগদানের জনগণ শুধু বিস্মিতই হননি। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুদ্ধও হয়। ১৫ আগষ্ট ১৯৮৪ তারিখে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমাবাজি সংঘঠিত হয়।

১৮ আগষ্ট ১৯৮৪ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ রেডিও ও টিভি ভবনদ্বয়ের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শিত হয়।

২৭ আগস্ট ১৫ জোটের আহবানে সারা সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। প্রতিনিয়ত সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে বিভিন্ন বিক্ষোভ দিবস ও বিক্ষোভ সমাবেশ চলতে থাকে।

৩০ আগষ্ট ১৯৮৪ দেশের ডাক্তাররা পালন করেন ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট।[২০]

উল্লেখ্য, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবীদের সমাবেশে শেখ হাসিনা তার ভাষণে ১৯৭৫ সালের পর সব সরকারকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করে। এর ফলে বিএনপির নেতা ও কর্মীদের মধ্যে (বিরুপ) প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ তারিখে দৈনিক দেশ পত্রিকা প্রকাশের দাবিতে সারা দেশে সংবাদপত্রগুলো একদিনের জন্য বন্ধ থাকে।

১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সারা দেশে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। এইদিন ব্যাপক ভাঙচুর, মিছিল গুলিবর্ষণ, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর হয়। বিভিন্ন স্থানে ৭ ও ১৫ দলে সমাবেশে বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিত দেয়।

বিভিন্ন সমাবেশ সভা দলীয় কার্যাবলে বৈঠকে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার আহবান জানান শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া।

২৭ সেপ্টেম্বর কালিগঞ্জে প্রদর্শিত বিক্ষোভ মিছিলে সামরিক সরকার সশস্ত্র আক্রমন চালায়। ওইদিন কালীগঞ্জের জাতীয় পার্টির কুখ্যাত নেতা আজম খান প্রকাশ্যে দিবালোকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা ও বাংলাদেশে রেডক্রসের ভাইস চেয়ারম্যান ময়েজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রকাশ্যে দিবালোকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

৩ অক্টোবর ১৯৮৪ এরশাদের সামরিক সরকার সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ ও খবর পত্রিকা ২টির প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৩ অক্টোবর ১৯৮৪ ১৫ দল ৭ দল জামায়াত প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল করে হরতালে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবি করে নেতারা।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয় সরকারের তরফ থেকে বিরোধী দলগুলোর ৫ দফা উপেক্ষা নির্বাচনী তফসিল ঘোষণাকে ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। পুনরায় বিরোধী দলগুলো সামরিক প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

১৪ অক্টোবর ১৯৮৪ ১৫ ও ৭ দলীয় জোট বিশাল সমাবেশ করে নয়া আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করার আহবান জানায়।

১৫ দল আর কোনো সংলাপ বা গোলটেবিল বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জানায়। উভয় জোটই ১৪ অক্টোবরের সমাবেশে ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ ২৪ ঘন্টার হরতাল সহ ২৭ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের আহবান জানানো হয়।

দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার কারনে ২৭ অক্টোবর ১৯৮৪ তারিখে সরকার ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। ২৫ নভেম্বর ১৯৮৪ তারিখে এরশাদ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তার চাকরির মেয়াদ আরো এক বছরের জন্য বৃদ্ধি করেন।

১৫ ও ৭ দলীয় জোটের আহবানে ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ সারাদেশে ২৪ ঘন্টাব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ১৫ ডিসেম্বর এরশাদ এক বেতার ও টিভি ভাষনে ৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচন বাতিলের কারণ ব্যাখ্যা করে শিগগিরই নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তারিখে বিরতিহীন ২৪ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০ ডিসেম্বর সামরিক সরকার ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪ ২ দিনের জন্য হরতালসহ সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তথাপি সামরিক সরকারের এই ঘোষণা সত্ত্বেও সারা দেশে ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪ বিরতিহীনভাবে পালিত হয় ৪৮ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতাল।[২১]

১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৪ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বেতার ও টেলিভিশনের এক তরফা ও বিশেষ দলীয় প্রচার এবং মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় চেতনা বিরোধী অপসংস্কৃতি, সম্প্রাদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি প্রচার বন্ধের দাবিতে জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে।

১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালন করে।

১৫ জানুয়ারি ১৯৮৫ এক সরকারি ঘোষণায় ৬ এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখ সংসদ নির্বাচনের জন্য নতুন তফসিল ঘোষণা করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ডাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে গুলিতে নিহত হন ছাত্রলীগ নেতা রাউফুন বসুনিয়া। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের বিক্ষোভে সরগরম হয়ে ওঠে। যদিও অনেকেই মনে করেন এই হত্যাকান্ডে সামরিক সরকারের বিশেষ বিভাগের কতিপয় লোকের হাত ছিল তথাপি ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একই তারিখে ১৫ ও ১৭ দলীয় ঐক্যজোট সরকার ঘোষিত ৬ এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[২২]

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ঢাকায় আংশিক হরতাল পালিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত সাংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল স্থগিত ঘোষণা করা হয় বিরোধী দলগুলোর চাপের মুখে।

১ মার্চ ১৯৮৫ তারিখ তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রেডিও টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ও অসহযোগিতার কারণে প্রস্তাবিত ৬ এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখের সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর এর প্রতি জনগণের আস্থা আছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য তিনি ২১ মার্চ ১৯৮৫ তারিখে 'গণভোট' অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে এরশাদ দেশে পুণরায় আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকদের পদ দফতর এবং বিশেষ সামরিক আইন আদালত পুনর্বহালে কথা। ঘোষণা করেন। এছাড়াও সর্বপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[২৩]

অতঃপর ২ মার্চ ১৯৮৫ নির্বাচন কমিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মসূচি বাতিল ঘোষণা করে।

২১ মার্চ ১৯৮৫ দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ 'হ্যাঁ' 'না' ভোটের মাধ্যমে জনমত যাচাই করলেন। কিন্তু ভোট কেন্দ্রগুলোতে গণভোটের দিন দেখা গেল ভোটার নেই। এরশাদের অর্থে, কিছু কর্মী বাহিনী সিল মেরে ভোটের বাক্স ভরে দিয়েছে এবং এরশাদ তার নিজের পক্ষে রায় বলে ঘোষণা দেন।[২৪]

৯ এপ্রিল ১৯৮৫ নির্বাচন কমিশন ১৬ ও ২০ ১৯৮৫ উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা দেয় এবং যথারীতি বিরোধী দলের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়াই নির্বাচন যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৫ মাস বন্ধ থাকার পর ২৩ জুলাই ১৯৮৫ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়া হয়।[২৫]

এরশাদ সরকার এ বছর তার মন্ত্রিপরিষদ পুণর্গঠনের কাজ করেন। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তার স্বার্থরক্ষাকারী ব্যক্তি এবং বড় রাজনৈতিক দলের দলছুট নেতাদের সমন্বয়ে তার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হয়।

১৬ আগস্ট ১৯৮৫ এরশাদ জনদল ভেঙ্গে গঠন করেন ৫টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ফ্রন্ট। [২৬]

ঘরোয়া রাজনীতি বন্ধ থাকায় দেশের বিরোধী দলগুলোর কার্যক্রম স্তিমিত ছিল। ১ অক্টোবর ১৯৮৫ থেকে পুনরায় ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ১১ নভেম্বর ১৯৮৫ তারিখে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে সারা দেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ তারিখ এক রেডিও-টিভির ভাষণে এরশাদ দেশে ১ জানুয়ারী ১৯৮৬ তারিখ থেকে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[২৮]

১৯৮৫ সাল এ সময়টা জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজের ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করার জন্য গণভোট, উপজেলা নির্বাচন, সর্বোপরি এরশাদ তার পূর্বসূরি জেনারেলদের মতো ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিভিন্ন দল ভেঙ্গে তার নিজস্ব দল গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেন।

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারী জেনারেল এরশাদ জাতীয় ফ্রন্টকে জাতীয় পার্টিতে পরিণত করেন। ইতিমধ্যে তার দলে বিরোধী প্রধান দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ নেতার আবির্ভাব ঘটে। ১২ জানুয়ারী ১৯৮৬ নবগঠিত জাতীয় পার্টি বায়তুল মোকাররমের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। এ সমাবেশে এরশাদ ঘোষণা করেন জাতীয় পার্টি আমার দল। সরকারের এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকার বিরোধী আন্দোলনও দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি ঘোষণার পর থেকে পুনরায় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। এরশাদের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট রাজপথ দখল করে। ১৯৮৬ সালের ২ মার্চ এক রেডিও-টিভির ভাষণে জেনারেল এরশাদ ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬ তারিখে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করে। ১৯৮৬ সালের ২০ ও ২১ মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে, সামরিক শাসন অবসান সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ২১ মার্চ ১৯৮৬ পর্যন্ত প্রধান রাজনৈতিক জোটসমূহের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়।

১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ এরশাদ জাতির উদ্দেশ্য বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বিরোধী জোটগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলেন সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে এবং প্রশাসন নির্বাচনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন। বিরোধী দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে সব ধরনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোন প্রচার করা হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ আদেশ আগামীকাল থেকে কার্যকর হবে। [২৮]

এদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ২১ মার্চ ১৯৮৬ সন্ধ্যায় ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের নেতারা পৃথক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের বৈঠক চলে তথাপি চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২২ মার্চ সমাবেশে ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের আহবানে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

২২ মার্চ ১৯৮৬ সন্ধ্যায় রেডিওর এক ঘোষণায় বলা হয় ১৫ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২২ মার্চ ১৯৮৬ সন্ধায় ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ১৫ দলীয় জোট নেতাদের বৈঠক। বৈঠকেও আসন বণ্টন নিয়ে সৃষ্ট মতবিরোধের কারণে বামপন্থী কয়েকটি দল ১৫ দল থেকে বেশি এবং তারা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত জানায়।৭ দলীয় জোট ও পরিশেষে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত জানায়। ১৫ দল থেকে বের হয়ে আসা দলগুলো এ দলের জন্য দেয়। ২৪ মার্চ ১৯৮৬ ছিল এরশাদের কার্যকরী ক্ষমতা দখলের দিন। অর্থাৎ এ দিনটিকে বিভিন্ন সংগঠন দল জোট কালোদিবস হিসেবে আখ্যায়িত করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ দিবস উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে এক বিশাল জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন, আমরা নির্বাচন চাই, নির্বাচন করব এবং নির্বাচনের মাধ্যমেই আমরা ক্ষমতায় যেতে বিশ্বাসী। কিন্তু জনগণের কাছে যে ওয়াদা দিয়েছি ৫ দফায় তা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে যেতে পারি না এবং ৫ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

১৫ দলীয় জোটও ২৪ মার্চকে কালো দিবস হিসেবে পালন করে। নির্বাচনী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ব্যালটের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান।[২৯]

ইতিমধ্যে নির্বাচনের তারিখ পূর্ণনির্ধারণ করে ৭ মে ১৯৮৬ করা হয়। ৪ মে ১৯৮৬ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটলে ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। [৩০]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এই নির্বাচনে অংশ নেয়। ৭ মে ১৯৮৬ তারিখ হিংসাত্মক প্রহসনমূলক জাতীয় সাংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮৪ কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। ফলাফল ঘোষণার এক পর্যায়ে এরশাদ সরকার কারচুপির লক্ষ্যে রেডিও ও টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা বন্ধ করে দেয় এবং পরবর্তীতে বহুলভাবে প্রচলিত মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল ছিনিয়ে নিয়ে এরশাদ সমর্থনপুস্ট জাতীয় পার্টিকে ১৮৩টি আসনে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় এবং আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীকে যথাক্রমে ৭৬ এবং ১০টি আসন দেয়া হয়।

৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার নির্বাচনে ভয়ভীতি প্রদর্শন বল প্রয়োগ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জালভোট প্রদান এবং সর্বোপরি সরকারি প্রশাসনিক যন্ত্রসহ নির্বাচন কমিশনকে ভীতি প্রদর্শনে সরকারের পক্ষে। মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ৮ দলীয় ঐক্যজোটের প্রকৃত বিজয়কে নস্যাৎ করা হয়েছে। তারা ভোট পূর্ণনিনা এবং যেসব আসনে শাসক দল কর্তৃক অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে সেসব আসনে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায়। (সূত্র- সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৯৮৬)। নির্বাচনের প্রায় ২ মাস পর তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বাসে ১৯৮৬ সালের ১০০ জানুয়ারি। ওই সংসদের শামসুল হুদা স্পিকার, এম কোরবান আলী ডেপুটি স্পিকার, মিজানুর রহমান চৌধুরী সাংসদ নেতা এবং শেখ হাসিনাকে বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত করা হয়। আওয়ামীলীগ সংসদ অধিবেশন বর্জন করে।[৩১]

এ সংসদের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো অধিবেশনে সপ্তম সংশোধনী বিল পাস। এ বিলে মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদের সামরিক আইন জারি এবং তারপর থেকে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত গৃহীত সব আইন নির্দেশ ও অধ্যাদেশ এবং তার বলে গৃহীত ব্যবস্থা গুলোর অনুমোদন বা বৈধকরণ করে নেয়া। এ অর্থ বিলের তীব্র বিরোধীতা করে বিলের প্রতিবাদে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে বিরোধী দল। অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমর্থনে জাতীয় পার্টি বিলটি পাস করার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেয়।

তৃতীয় জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ৭ ও ৫ দলীয় জোট সাংসদ বাতিলের দাবি জানাতে থাকে।[৩২] এরশাদের সপ্তম সংশোধনীর বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো রাজপথে ব্যাপক গণআন্দোলনের ডাক দেয়।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল এইচ এম এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করে নিজেকে তার চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ এরশাদ নিজেকে জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এক সরকারি ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত করা হয় ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬ তারিখ। ওই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারণ করা হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬। [৩৩]

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখ এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্যজোট, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট, মাওবাদী বামপন্থী ৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন খালেদা জিয়া ও শেষ হাসিনার বিভিন্ন জেলার জনসভায় পুলিশ বাধা প্রদান করে এবং জনসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অবশেষে শেষ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দি করা হয়। ওই দিন বিরোধী দলগুলোর ডাকা সকাল সন্ধ্যা হরতাল থাকা সত্ত্বেও এবং বিরোধী দলগুলোর বিরোধীতা সত্ত্বেও ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। নির্বাচনী নাটকীয়তা শেষে বিজয়ী হয়ে ২০ অক্টোবর ১৯৮৬ জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহন করে।[৩৪]

বিরোধী জোটগুলোর ডাকা ২৩ অক্টোবর কালো দিবস উপলক্ষে ৮ দল সব ভেদাভেদ ভুল গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন জেনারেল এরশাদের সাড়ে ৪ বছরের কার্যক্রম বৈধ করার জন্য সাংসদে যারা ভোট দেবেন, জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না, অন্যদিকে বেগম জিয়া ও দেশব্যাপী আহুত এই কালো দিবস উপলক্ষ্যে বলেন "আসুন আমরা সামরিক শাসনজারির পর যেভাবে আন্দোলন শুরু করেছি সেভাবে আবার আন্দোলন শুরু করি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন জানাই, জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন "প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তাকে অপসারণের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই। [৩৫]

১৯৮৭ সাল শুরু হয় যথারীতি বিরোধী দলগুলোর নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মকান্ড দিয়ে। ক্রমশ: স্বৈরাচার জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নবতর অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৮৬ সালে সূচিত সামরিক শাসন বিরোধী পাঁচদফার আন্দোলন এ বছর পুরোদমে চলতে থাকে। এ সময় জাতীয় সাংসদ বাজেট, বিরাষ্ট্রীয়করণ ও জেলা পরিষদ বিল উত্থাপনের ফলে সরকার বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এসব বিল বাতিল এবং স্বৈরশাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী দলগুলো যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হয়।

১ জানুয়ারী ১৯৮৭ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন।

১৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ছাত্র এবং পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারী দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

২১ এপ্রিল ঢাকায় একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়।

২১ জুন জোটের আহবানে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

১২ জুলাই সরকার জাতীয় সাংসদে স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ সংশোধনী বিল পাশ করে নেয়। ওই বিলে সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনে জড়িত করার ব্যবস্থা করা হয়। ওই বিলের বিরুদ্ধে দলীয় জোট সাংসদ থেকে ওয়াকআউট করে এবং ১৩ জুলাই সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালন করে।

১৪ জুলাই ১৯৮৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে ২ জন নিহত ও অসংখ্য ছাত্র আহত হয়। এ ঘটনায় সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।[৩৬]

৩ জোট (৮, ৭, ও ৫) জেলা পরিষদ বিল বাতিল এবং এরশাদের পদত্যাগের দারীতে ২২ জুলাই ১৯৮৭ থেকে দেশব্যাপী বিরতিহীন ৫৪ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে। অবিরাম হরতাল পালন শেষে ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত ৮ দলীয় জোটের জনসভা থেকে ৩০ জুলাই ১৯৮৭ সারা ঢাকায় বিক্ষোভ ও রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ৩০ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে সব বিরোধী দল যোদগান করে। ফলে এরশাদ

বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরশাদ বাধ্য হয়ে জেলা পরিষদ বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য ১ আগষ্ট সাংসদে ফেরত পাঠান।

১২ আগষ্ট ১৯৮৭ তারিখে সারা দেশে পালিত হয় শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) আহত ২৪ ঘন্টা হরতাল।

১৩ আগষ্ট ১৯৮৭ সরকার দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার প্রকাশনা অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৬ আগষ্ট (১৯৮৭) ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট ৭ অক্টোবর ১৯৮৭ তারিখে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২৮ আগষ্ট ১৯৮৭ তারিখ এরশাদ এক ঘোষণায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তারিখে বঙ্গভবনে আলোচনা বৈঠকের আহবান জানান। ২৯ আগষ্ট ১৯৮৭ তারিখে ৮ দলীয় ঐক্যজোটসহ বিরোধী দলগুলো ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৪ অক্টোবর তারিখে বিরোধী দলগুলো দেশে ভয়াবহ বন্যায় উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন করে ১০ নভেম্বর তারিখ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯ ও ২০ অক্টোবর শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ এর (স্কপ) আহবানে ৪৮ ঘন্টার বিরতিহীন হরতাল পালিত হয়। ১৪ অক্টোবর ১৯৮৭ তারিখে সরকার বিরোধী ঐক্যজোট ত্রয়ের ডাকা ১০ নভেম্বরের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিকে বেআইনী ঘোষণা করে। জোট ও নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ২৬ অক্টোবর ১৯৮৭ উপজেলা সদরসমূহে ঘেরাও কর্মসূচি যথাযথভাবে পালিত হয়।

২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার মধ্যে তাদের দলীয় শীর্ষ নেতাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠক শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের যৌথ ঘোষনায় বলা হয়, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আমরা ১ ও ১০ নভেম্বরসহ আন্দোলনের সব কর্মসূচার সাফল্যের লক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাব।

১ নভেম্বর (১৯৮৭) ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটসমূহের জেলা পরিষদগুলো ঘেরাও কর্মসূচি যথাযথভাবে পালিত হয়। এ সময় বহু স্থানীয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী দিনও শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ৮ নভেম্বর এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা শহরে ৫ বা ততধিক লোকের মিছিল ও সমাবেশ ১৫ নভেম্বর ১৯৮৭ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ দিনই সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। ৯ নভেম্বর ১৯৮৭ তারিখে সরকার দেশের কয়েকটি ফেরিঘাট ও ঢাকামুখী যাত্রীবাহী ট্রেন বন্ধ করে দেয় এবং ১৪৪ ধারা জারি করে।

সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হাজার হাজার লোক রাস্তায় মিছিল বের করে। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র জনতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা মিছিলকারীদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপসহ গুলিবর্ষণ করে। এতে চারজন নিহত এবং অনেক লোক আহত হয়। নিহতদের অন্যতম ছিল নূর হোসেন নামে এক বলিষ্ঠ সুঠামদেহী যুবক নূর হোসেন তার উন্মুক্ত বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' এবং পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক' লিখে নিয়ে একটি ছাত্র জনতার মিছিলের অগ্রভাবে ছিল। ঘাতকের বুলেট নুর হোসেনের বুক ভেদ করে বের হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ১১ নভেম্বর সরকার ৮ দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনা ও ৭ দলীয় জোটনেত্রী খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অন্তরীন করে রাখা হয়।

১২ নভেম্বর ৩ জোটের আহবানে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ওই দিনই সরকার এক ঘোষণায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় গুলি করার জন্য নিরাপত্তা বহিনীকে নির্দেশ দেয়। ১৪ থেকে ১৭ নভেম্বর প্রতিদিন। সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। এ সময় ব্যাপক সংঘর্ষ ও শত শত নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়। ১১ ও ১২ নভেম্বর ৩ জোটের আহবানে সারা দেশে পালিত হয় বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতাল। অতঃপর ২৩ ও ২৪ নভেম্বর সারা দেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ২৫ নভেম্বর ঢাকায় কয়েকটি স্থানে সভা সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৭ নভেম্বর ঢাকাসহ সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণাসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও নারায়নগঞ্জে সন্ধ্যা আইন জারি করে। ২৮ নভেম্বর ১৯৮৭ তারিখে এরশাদ এক বেতার ও টিভি ভাষনে রাজনৈতিক সমস্যা নিরাময়ে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আলাপ আলোচনার প্রস্তাব দেয়। ২৯ ও ৩০ নভেম্বর তথা ১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ বিরোধী দলগুলোর আহবানে সারাদেশে বিরতিহীন ৭২ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ৩ ডিসেম্বর সরকার সাপ্তাহিক। রোববার পত্রিকার প্রকাশনা অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৫ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ১০ সাংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের একসভায় জাতীয় সাংসদ থেকে আওয়ামী লীগ সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ তারিখে এরশাদ তৃতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১০ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে অন্তরীন থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১১ ডিসেম্বর সরকার পুণরায় দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করে । ১২ ডিসেম্বর (১৯৮৭) ৭, ৮ ও ৫ দলের আহবানে সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ৩ জোটের আহবানে সারা দেশ বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় এবং ২৯ তারিখ শুধু ঢাকা শহরে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে গতিশীল রাখার প্রয়াশে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, জনগণের একদফা আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে পদত্যাগ করতেই হবে। এর পাশাপাশি তারা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের দাবিতে অটল থাকে। তৃতীয় সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার পর পরই জেনারেল এরশাদ ৯০ দিনের মধ্যে ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। তদানুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ তারিখে ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন। আন্দোলনরত সব জোট ও দলগুলো জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অধীনে আর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা দেন সব বিরোধী জোট ও দল নির্বাচনের ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচন প্রতিরোধ করার ডাক দেয়।[৩৮]

১৯৮৮ সালের ৮ জানুয়ারি ৩ জোটের (৮, ৭ ও ৫) এক যৌথ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়। যে, এরশাদের অধীনে আর কোন নির্বাচনে তারা অংশ নেবে না। [৩৯]

২০ জানুয়ারি ১৯৮৮ ৩ জোটের আহবানে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ওই হরতালের দিন ঢাকা শহরের কয়েকটি স্থানে জাতীয় পার্টির মাস্তানরা জোটের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায় এক সংঘর্ষ বাঁধে।

২৪ জানুয়ারী ১৯৮৮ শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ৮ দলীয় জোটের পূর্ব নির্ধারিত জনসভায় যোদগান করেন। শেখ হাসিনা বিভিন্ন স্থানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। অবশেষে মূল জনসভা মঞ্চে উঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই কে

বা কারা শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। শেখ হাসিনাকে বাঁচাতে গিয়ে গুলিতে নিহত হন আবুল কাশেম। এরপর শুরু হয় নিরীহ জনতার ওপর লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলিবর্ষণ। পুলিশ কমিশনার রফিকুল হুদার নেতৃত্বে স্বৈরাচারী সরকারে আইন রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারের ভাড়া করা স্বশস্ত্র মাস্তান গুন্ডাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়।[৪০]

ওই ঘটনায় ২৫-৩০ জন নিহত হয় এবং আহত হয় বিপুল সংখ্যক ছাত্র জনতা। নিহত ২৪ জনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল ও ২৮ জানুয়ারি ১৯৮৮ সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।[৪১]

উল্লেখ্য, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ তারিখে সরকার এক নতুন আদেশ জারির মাধ্যমে সব ধরনের নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ করে।[৪২]

এ আদেশে বলা হয়:

ক. জাতীয় সাংসদ ও পৌর করপোরেশন নির্বাচন প্রতিরোধ কিংবা নির্বাচনের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কিংবা প্রকাশ্য স্থানে কোনো সভা ও সমাবেশ করা যাবে না।

খ. নির্বাচন বিরোধী সভা ও সমাবেশে কেউ ভাষণ দিতে পারবে না বা এ ব্যাপারে কোন স্লোগান তোলা বা মিছিল করা যাবে না।

গ. নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে এমন তৎপরতায় কাউকে লিপ্ত হতে দেখা যাবে না।

এভাবে অবশেষে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ একটি উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পুণরায় আরেকটি ভোটার এবং প্রতিযোগীতাবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে চতুর্থ জাতীয় সাংসদের নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। নির্বাচনে বিরোধী দলগুলা অংশগ্রহণ করেনি। এ নির্বাচন রাষ্ট্রপতি জেনারেল হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদের। জাতীয় পার্টি ও জেনারেল এরশাদ সমর্থক কমান্ড অপজিশন পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সিরাজী এবং ফ্রিডমপার্টিসহ মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। মূলত এসব দলকে নানা ধরনের সুবিধা দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো হয়। জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের জন্য ৯৭৭ জন প্রার্থী ছিল। পূর্বনির্ধারিত ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। এতে যথারীতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি তিন চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে জয়লাভ করে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়।[৪৩] বিরোধী দলগুলো এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে এবং এ সংসদকে ভোটারবিহীন নির্বাচিত সংসদ হিসেবে চিহ্নিত করে। জেনারেল এরশাদ সরকার নির্বাচনে মিডিয়া ক্যু ও ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। দেশ বিদেশের সব রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতায় রেখে কোন নির্বাচন সম্ভব নয়।

৭ জুন ১৯৮৮ তারিখ জাতীয় সংবিধানের অষ্টম সাংশোধনী ১৯৮৮ অনুমোদিত হয়। এ দেশের বিভিন্ন মহলের বিরোধিতা সত্ত্বেও এরশাদ সরকার রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিল পাস করে নেয়। এর প্রতিবাদে ১৩ জুন (১৯৮৮) ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে সারা দেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল।[88]

বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এছাড়া ওই অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট ভেঙ্গে ঢাকার বাইরে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটসহ ৬টি জেলা সদরে সুপ্রমিকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি করে বেঞ্চ রাখার বিধান রাখা হয়। বিরোধী দলগুলো এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে ২ সেপ্টম্বর দেশের আইনজীবীদের দাখিলকৃত এক রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক অষ্টম সংশোধনীর হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ এ অংশটি সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করা হয়। ফলে জেলা সদরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন বিল বাতিল করা হয়। এ ঐতিহাসিক রায় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[8৫]

৮ জুন ১৯৮৮ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী সমিতি আদালত বর্জন, সভা ও শোভাযাত্রা করে সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আহবানে ১৪ জুলাই সারা দেশে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এমনকি সরকার অনুগত বিরোধী দলও অষ্টম সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে ওয়ার্কআউট করে। ১৯৮৮ সালের জুন মাসের পর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো এরশাদ বিরোধী কোনো আন্দোলন সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার অন্যতম কারণ দেশের ২টি বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে আদর্শগত, রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতিগত ব্যাপারে মতভেদ। এছাড়াও এ দল ২টির নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, কৌশল, পথ ও পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে পার্থক্যও অনেকাংশে দায়ী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিককাল থাকার লক্ষ্যে এরশাদ ও বিষয়গুলোর শুধু ব্যবহারই করেননি। তিনি এ ২টি দলের নেতৃত্বের বিরোধীকে আরো প্রকট করে তুলতে সক্ষম হন সুচতুর কুটকৌশলে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ সালের জুন মাসের পর হতে এ ২টি দলে নেত্রীর যতটা সময় ব্যয় করেন এরশাদ ও তার সরকারের কার্যকলাপের বিরোধিতায় তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন ও ব্যস্ত থাকেন পারস্পরিক সমালোচনায়। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন শিবিরের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে আদর্শগত, রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতিগত ব্যাপারে মতভেদ। এছাড়াও এ দল ২টির নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, কৌশল পথ ও পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে পার্থক্যও অনেকাংশ দায়ী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিকাল থাকার লক্ষ্যে এরশাদ এ বিষয়গুলোর শুধু ব্যবহারই করেননি। তিনি এ ২টি দলের নেতৃত্বের বিরোধকে আরো প্রকট করে তুলতে সক্ষম হন সুচতুর কুটকৌশলে। দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলার বৃহৎ এ দ্বন্দ্বের ফলে জনগণ শুধু আঘাতপ্রাপ্তই হয়নি, বিভ্রান্ত ও হয়েছে দারুণভাবে। এসব কিছুর ফলশ্রুতিতে এরশাদ ও তার সরকার শুধু লাভবানই হননি নির্বিঘ্নে ও নির্ঝাটে অতিবাহিত করেন ১৯৮৮ সাল।

এসব ছাত্র সংঘর্ষের ফলে প্রায়ই দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলে বন্ধ ঘোষিত হয় এবং অনেক তরুন ছাত্র ও যুবক হতাহত হয়।

১৯৮৯ সালের ১১ জানুয়ারি ঢাকায় আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলস। তিনি ঢাকায় এসে প্রেসিডেন্ট এরশাদ, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেখতে আগ্রহী হয় ।[৪৬]

২৪ জানুয়ারী ১৯৮৯, ৭ দলীয় জোট জামায়েতে ইসলামীর আহবানে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ তারিখে নিরপেক্ষ সরকারের অধিনে নির্বাচনের দাবি জানায়। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানায়। ২৮ জুন ১৯৮৯ আওয়ামী লীগের আহবানে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বাজেটে করা বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।[৪৭]

৬ জুলাই এরশাদ জাতীয় সংসদে নবম সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন এবং বিরোধী দলের চরম বিরোধীতার মুখে ১০ জুলাই সংসদে নবম সংশোধনী বিলটি পাস করে। ১০ আগষ্ট গভীর রাতে শেষ হাসিনার বাসভবনে (বঙ্গবন্ধু ভবন) সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। শেখ হাসিনা এ ঘটনাকে তার প্রাণনাশের চেষ্টা বলে অভিযোগ করেন।[৪৮]

৩ সেপ্টেম্বর (১৯৮৯) ৮ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে ঢাকায় পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ১৭ ও ১৮ অক্টোবর শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহাবানে সারা দেশে বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টার হরতাল পালিত হয়।

১ নভেম্বর ১৯৮৯ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের ১২৭ নেতাকর্মী গুলিস্তান চত্বরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে ১০ ঘন্টার এক প্রতীকী অনশন পালন করেন। এ সময়ে মঞ্চে এক অদ্ভুত সংমিশ্রন সংগঠিত হয়। ডানপন্থী, বামপন্থী, রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধা, এরশাদ বিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীর।

রাজনৈতিক নেতা খালেদা জিয়ার সঙ্গে অনশনে একে একে সংহতি প্রকাশ করতে যান। ৫ নভেম্বর ৭ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে সারা দেশে পালিত হয় সকাল সন্ধ্যা হরতাল। ১১ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে ৭ দলীয় ঐক্যজোট একতরফাভাবে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ওই ঘোষণায় ২০ নভেম্বর সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের চারদিকে অবস্থান। ধর্মঘটের আহবান জানান। ১৯ নভেম্বর ১৯৮৯ সরকারি দল জাতীয় পার্টি ঢাকায় আয়োজন করে এক হরতাল বিরোধী মিছিল। এতে এরশাদও অংশগ্রহণ করেন।

৮ দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনা ২৯ নভেম্বর ১৯৮৯ জনগণের প্রতি আহবান জানান, সারাদেশে পূর্ণদিবস হরতাল পালনের। খালেদা জিয়াও ২৯ নভেম্বর পূর্ণদিবস ও ৩০ নভেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালনের আহবান জানান। ৩০ নভেম্বর হরতাল পালন শেষে বিকেলে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভায় কে বা কারা হাত বোমা নিক্ষেপ করে। এতে একজন নিহত ও ১২ জন মারাত্মকভাবে আহত হন।[৪৯]

২০ ডিসেম্বর (১৯৮৯) ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট সারা ঢাকায় আয়োজন করে এরশাদ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল। এরপরেই ক্রামন্বয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গতিময়তা পেতে থাকে।

১৯৯০ সালের শুরু থেকেই বিরোধী দলগুলোর সরকার বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। প্রতিটি সভা ও সমাবেশ মিছিলে ছাত্র জনতা তথা আপামর জনসাধরণের চাপা ক্ষোপের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। আন্দোলনের উত্তেজনা ক্রমেই বহ্নিশিখার মতো বেড়ে উঠতে শুরু করে। প্রধান ৩টি জোটসহ দেশের ছোটখাটো সব দল আন্দোলনের একই কর্মসূচী পালন করতে শুরু করে। এ আন্দোলনের গতিরোধ করার মতো শক্তি এরশাদের ছিল না। বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন চলতেই থাকে।[৫০]

১০ জানুয়ারি ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ১টি ছাত্রসংগঠন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও তথ্য প্রচারের দাবিতে রেডিও টেলিভিশন ভবন ঘেরাও ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ৩ ফেব্রুয়ারী এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে আওয়ামী লীগ উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৪) ৭ ও ৫ দলীয় জোট উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। পুনরায় ১৯৯০ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ ছাত্রলীগ নেতা চুন্নু নিহত হয়। এ ঘটনার অজুহাতে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালে ঘোষণা করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) ৮ দলীয় জোটের আহবানে ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ৭ এপ্রিল দীর্ঘ ৪০ দিন বন্ধ রাখার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়। ৭ মে ১৯৯০ টাকা মহানগর আওয়ামী লীগ স্বৈরাচার বিরোধী এক বৃহত্তম কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ২৮ জুন তারিখে এরশাদ সরকারের ঘোষিত বাজেটে কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল, ১২ জুলাই ১৯৯০ এর বিরোধী দলীয় নেতাদের আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানায়। ১৩ জুলাই বিরোধী দলগুলো এরশাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৫১]

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন মহল থেকে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি ও ৭ দলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি পরামর্শ দেয়া হয় এক মঞ্চ থেকে যৌথভাবে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য। ৭ দলীয় জোটনেত্রী ও মঞ্চের ঐক্যের কথা বলেন। ৮ দলীয় জোটনেত্রী বলেন, মঞ্চের প্রয়োজন নেই, রাজপথের ঐক্য স্বৈরাচারের পতন ঘটাবে।[৫২]

সেপ্টেম্বর ১৯৯০ এর শেষের দিকে ডাকসুর উদ্যোগে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ কনভেনশন থেকে ডাকসু এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করলে সারাদেশে সরকার বিরোধী মনোভাব চাঙ্গা হয়ে ওঠে। একই গণতন্ত্রমনা সব ছাত্র সংগঠনের মধ্যে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী মনোভাব সম্প্রসারিত হয়। অতঃপর ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি আমান উল্লাহ আমানের নেতৃত্বে আওয়ামী সমর্থক ছাত্রলীসহ অন্য গণতন্ত্রমনা ও স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

১০ অক্টোবর ১৯৯০ তারিখে ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর সচিবালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি। এ ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে সচিবালয় ও মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় পুলিশ ছাত্র জনতা এক রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলিবর্ষণ করা হয়। এ সংঘর্ষে উল্লাপাড়া কলেজের জেহাদসহ ৫ জন নিহত এবং এক পুলিশসহ ৩শ এর ও বেশি ছাত্র যুবক আহত হয়।[৫৩]

এদিনই ২২টি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে আন্দোলন পরিচালনার ঘোষনা দেয় এবং এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়প্রত্যয়ে কাজ করে। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহুত হয় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ১১ অক্টোবর ১৯৯০ পালিত হয়। এদিন সকাল ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের একটি মিছিল শাহবাগ মোড়ে পৌঁছলে পুলিশ তাদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে ডাকসুর প্রথম সারির বেশ কয়েকজন নেতাসহ শতাধিক ছাত্রনেতা ও কর্মী আহত হয়। পুলিশের এহেন নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৩ অক্টোবর ১৯৯০ ঢাকায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। ওই ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মনিরুজ্জামান মনিরসহ ২ জন ছাত্র নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। মনিরুজ্জামানের লাশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্তরে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশ ঘটে। ছাত্রদের সমাবেশ সমাপ্ত হবার পর সরকারের কতিপয় সশস্ত্র গুন্ডা মাস্তান বাহিনী আনবিক শক্তি কমিশনের ক্যাম্পাসে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং ঢাকার অন্যান্য স্থানেও ভাঙচুরে এক ত্রাস সৃষ্টি করে। এ অজুহাতে এরশাদ সরকার এক অধ্যাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।[৫৪]

১৪ অক্টোবর ১৯৯০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে বহু ছাত্র আহত হয়। এদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণাকে স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী বলে অভিহিত করা হয়। ঢাকার সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে ১৫ অক্টোবর পালন করা হয় অর্ধদিবস হরতাল।

ওইদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে এবং পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়। ওইদিনই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা এবং ওই সভায় ছাত্ররা ১৫ দিনব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচী, ঘোষণা করে। অপরদিকে ৮, ৭ ও ৫ দল এরশাদ সরকারের পতনের আন্দোলনে ঐক্যের প্রশ্নে অভিন্ন মত ব্যক্ত করে পৃথক বিবৃতিতে এরশাদ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্য ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে ১৬ অক্টোবর সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।[৫৫]

ওইদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে রেললাইন উৎপাটন, অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাংচুর, ব্যারিকেড স্থাপন ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়। চট্টগ্রামে জনতা পুলিশ সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়। বিভিন্ন মঞ্চ থেকে ৮ ও ৭ দলীয় জোট নেতারা এরশাদ সরকারের উৎখাতের আন্দোলনে সবাইকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানান।

১৭ অক্টোবর ১৯৯০ তারিখে এরশাদ সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। আহত ছাত্র নেতারা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কেন্দ্রীয়। মিনারে এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে পুনরায় দৃপ্ত শপথ ব্যক্ত করেন। এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ঢাকার জিরো পয়েন্টে কালো পতাকা উত্তোলন করে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ২০ অক্টোবর পুনরায় ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় ছাত্রদের। ২২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র শিক্ষক ও

অভিভাবকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ। নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয় গুলো খুলো দেয়ার সিদ্ধান্ত জানায় এবং এই সমাবেশে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয়।[৫৬]

৮.৭৫ দলের আহবানে ২৩ অক্টোবর ১৯৯০ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ও উপজেলা ঘেরাও: কর্মসূচী পালিত হয়। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে ৩ শতাধিক ছাত্র-জনতা এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মী আহত হয়। ২৪ অক্টোবার ১৯৯০ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বেঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের অধ্যাদেশ চ্যালেঞ্জ করে আবেদন পেশ করা হয়। আদালত এ ব্যাপারে সরকারের ওপর কারণ দর্শানোর রুলনিশি জারি করে। ৩টি ঐক্যজোটের আহবানে ২৭ অক্টোবর সারাদেশে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ও মনোযোগ অন্যদিকে নিয়ে আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য স্বৈরাচার এরশাদ এক কুটিল খেলায় মেতে ওঠে। ভারতের বাবরি মসজিদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে তার গুন্ডা বাহিনীর সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের আক্রমণ, দোকানপাট, বাড়িঘর, উপাসনালয়, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে থাকে এবং এ অজুহাতে সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করে ৩১ অক্টোবর ১৯৯০ তারিখে। সরকারের এ হীন চক্রান্ত বুঝতে পেরে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট অভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে এবং আয়োজন করে জনসমাবেশ ও শান্তি মিছিলের। সকলে মিলে মিশে সরকারের হীন চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়।[৫৭]

১ নভেম্বরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে ৪ নভেম্বর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মিছিলসহ গোলাপ শাহ মাজার এলাকায় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিনও পুলিশি হামলা চলে মিছিল ও সমাবেশে।[৫৮]

৫ নভেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলে আহবানে দেশে রেডিও টেলিভিশনে বস্তুনিষ্ঠ সঠিক খবর ও তথ্য পরিবেশনের দাবিতে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় সভা সমাবেশ। ওইদিনই সারাদেশে মেডিকেল ডাক্তাররা ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট পালন করে।

৮ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সংক্রান্ত নতুন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক ছাত্র সমাবেশ করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেলে পুলিশ বাধা দেয় এবং সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ১০ নভেম্বর ১৯৯০ সাল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে সারাদেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ১১ নভেম্বর ১৯৯০ সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে ছাত্র শিক্ষকরা যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়। ছাত্র শিক্ষকের এ যৌথ উদ্যোগ চলমান আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে অনেকের মতে উপরোক্ত ঘটনার পর থেকেই শুরু হয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবীদের অসহযোগ কার্যক্রম। [৫৯]

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে ১২ নভেম্বর ১৯৯০ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও এরশাদকে উৎখাতের আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাহলো এরশাদ সরকারের পতন |

১৭ নভেম্বর ছিল সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যর সারাদেশে গণদুশমন প্রতিরোধ দিবস পালনের আওতায় ছাত্রদের ঢাকার মন্ত্রী পাড়া ঘেরাওয়ের কর্মসূচী। ওইদিন সরকারের ভাড়া করা কিছু লোক ঢাকায় ১টি স্থানে সভার আয়োজন করলে, ছাত্র-জনতার তীব্র প্রতিরোধের মুখে তারা টিকতে পারেনি। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। [৬০]

১৮ নভেম্বর তারিখে ১৯৯০ সরকারের গুন্ডা-মাস্তান বাহিনীর একটি দল পুলিশের ছত্রছায়ায় ঢাকার রায়েরবাজারে আওয়ামী লীগের একটি মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। এতে অনেকে আহত হয়। ১৯ নভেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের আহবানে সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল ও সভা সমাবেশ কর্মসূচী পালিত হয়। হরতালের সমর্থনে দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত মিছিলসমূহে সরকারি, গুন্ডা, মাস্তান ও পুলিশের হামলায় আহত হয় ২ শতকেরও বেশি লোক। ওইদিন বিকালে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট পৃথক জনসমাবেশ থেকে ঘোষণা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা। ৩ জোটের প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ওই ঘোষণায় বলা হয়।

(১) হত্যা ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পেঃ

ক. সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারা অনুসারে এরশাদ ও তার সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত ৩ জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করতঃ রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উপরাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

খ. এ পদ্ধতিতে ওই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম সংসদে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা|

২. ক. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা সংসদ পদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো মন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না।

খ. অন্তবর্তীকালীন এ সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরেপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন, পুনর্গঠন, নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাশ করবেন।

গ. ভোটাররা যাতে করে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই আস্থা পুনঃস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ঘ. গণপ্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনসহ সব রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি সব রাজনৈতিক দলের প্রচার প্রচারণার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের কাছে অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এ সংসদের কাছে সরকার জবাবাদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

৪. ক. জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশের সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যেকোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোনো পন্থায়, কোনো অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

খ. জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন। নিশ্চিত করা হবে এবং প্রয়োগ করতে পারেন সেই আস্থা পুনঃস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

গ. মৌলিক অধিকার পরিপন্থী সব আইন বাতিল করা হবে।[৬১]

৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের আহবানে ২০ নভেম্বর ১৯৯০ সারাদেশে সর্বাত্মক সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে সরকারি দলের যুব সংহতির ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। এতে সারাদেশে ছাত্ররা আরো বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে।

২১ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট ত্রয়ের ঘোষণা করে ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত অভিন্ন কর্মসূচি। ওইদিন সারাদেশে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ ঘটে।[৬২] ২২ নভেম্বর ১৯৯০ পুলিশ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। ২৩ নভেম্বর ঢাকায় বিএনপির মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ২৪ নভেম্বর পুলিশ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

২৫ নভেম্বর তারিখে এরশাদ সরকারের ভাড়া করা ছাত্রনেতা গোলাম ফারুক অভির নেতৃত্বাধীন সন্ধ মাস্তানরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐকার মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। মাস্তানদের সঙ্গে হাজার ছাত্রদের লড়াই এক ভয়াবহ রূপ নেয়। বহু হার এতে গুলিবিদ্ধ হয়। ওইদিনই গোলাম ফারুক অভিসহ আরও ৬ জন ছাত্রনেতাকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে বহিস্কার করা হয়।

২৬ নভেম্বর ও এরশাদের সশস্ত্র মাস্তান বাহিনী সন্ত্রাসী হামলা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এতে অনেক ছাত্র বিদ্ধ হয়। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাসের সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় আন্দোলনকারী শ্রমিক জনতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষ ও ছাত্রদের সহায়তা করার জন্য ক্যাম্পাসে ছুটে আসেন। অতঃপর ওইদিন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

২৭ নভেম্বর ১৯৯০ ভোরে পুলিশ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন যুবলীগের সভাপতি মোস্তফা মহসিনের বাসা ঘেরাও করে তাকে গ্রেফতার করে। ওইদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বরসহ বুয়েটেও ছাত্র বিক্ষোভ ও মিছিল চলতে থাকে।

এরশাদের সশস্ত্র মাস্তানরা ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালায়। এতে ৩ জন ছাত্র গুলিবদ্ধ হয়। পরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অভি-নীরুর মাস্তানরা টিএসসিতে মিছিলের ওপর সকাল সাড়ে ১১টার সময় গুলি চালায়। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা ও বাংলাদেশ মেডিকেল সমিতি (বিএমএ) এর তৎকালীন মহাসচিব ডা: মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এবং যুগ্ম সচিব ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের তরুণ শিক্ষক ডা: শামসুল আলম খান মিলন একত্রে একটি রিকশায় টিএসসি অতিক্রম করছিলেন। রিকশাটি টিএসসি অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অভি নীরুর মাস্তানদের বুলেট ডা. মিলনের পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়। হাসপাতালের নেয়ার আগেই তার মৃত্যু ঘটে। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ছাত্র, শিক্ষক ও ডাক্তারসহ সব পেশাজীবী মানুষ ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় নেমে পড়েন। ডা. মিলন হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সারাদেশে ছাত্র জনতার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিক্ষক ও ডাক্তাররা একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দেয়।[৬৩]

এদিকে এরশাদ ওইদিন সন্ধ্যায় এক রেডিও-টিভির ভাষণে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। দেশে জরুরি আইন ও ঢাকা শহরে কার্ফু জারি করা হলে ও ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থামেনি। জরুরি আইন উপেক্ষা করে মিছিল সমাবেশ বাড়তে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও ছাত্ররা হল ছাড়লো না। শিক্ষকরা পদত্যাগ করার এবং আইনজীবীরা কোর্ট বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ডাক্তাররা এরশাদ সরকারের অধীনে কাজ না করার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখেন। এদিন সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ রাখা হয়।

২৮ নভেম্বর ১৯৯০ পরিস্থিতির দারুন অবনতি ঘটে। জরুরি আইন ও কার্ফ্যু ভঙ্গ করে ছাত্রছাত্রী শ্রমিক, জনতা পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবিরা নামলেন বিক্ষোভ মিছিলে। ঢাকার মালিবাগে রেলপথ বন্ধ করে দিল শ্রমিক জনতা। ডেমরার দিকে সংঘর্ষ হলো শ্রমিক জনতা এবং পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে। এসব স্থানে গুলিবর্ষণে প্রাণ হারায় ৪ জন। ময়মনসিংহে গুলি চালানো হলো জনতার ওপর। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতেও পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-শ্রমিক জনতার সংঘর্ষে বহু লোক আহত হয়। ওই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপান এরশাদ সরকারের দেশে জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত আইন জারির কঠোর সমালোচনা করে।

২৯ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে সারাদেশে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে পালিত হয় সকাল সন্ধ্যা হরতাল। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে কারফিউ উপেক্ষা করে বিক্ষোভ মিছিল চলতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে ভাড়াটে মাস্তান ও সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হয় অনেকেই। গ্রেফতার করা হয় অনেক ছাত্র জনতাকে এবং সরকার সেনাবাহিনীকেও পুলিশ ও বিডিআরের পাশাপাশি মোতায়েন করেন।[৬৪]

৩০ নভেম্বর ১৯৯০ সকাল থেকেই উত্তাপ আর উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সেদিন ছিল শুক্রবার। ঢাকার জরুরি অবস্থা উপেক্ষা করে নেতাকর্মীদের পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষ বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে জুমার নামাজের পর শহীদদের স্মরণে গায়েবানা জানাজার পর জনগণ মিছিল করে অগ্রসর হতে থাকলে

সরকারের সশস্ত্র বাহিনী মিছিলে হামলা চালায়। ওইদিন ঢাকার জাতীয় প্রেসকাবের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। স্বনামধন্য কবি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে শত শত নারী রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে। স্বৈরশাসক এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে দেশের অন্যান্য প্রধান শহরগুলোতেও হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, জনতা বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের আহবানে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী ছাত্র-জনতা বিভিন্ন পেশার লোক এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে। ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু লোক নিহত ও আহত হয়। ঢাকা শহরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য শহরের সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। দেশের এহেন পরিস্থিতিতে সরকারের জাতীয় পার্টির সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ডা. এম এ মতিন ও অপর ৩ জন মন্ত্রীসহ ১৯ সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন।

যদিও ২ ডিসেম্বর ১৯৯০ দেশে কোনো হরতাল ছিল না। তথাপি ঢাকার বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লায় ছাত্র জনতার খন্ড খন্ড বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শিত হয়। এদিকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের এক সমাবেশে রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদ পাঠক ও ঘোষকদের একটি কালো তালিকা ঘোষণা করা হয়। এদিন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আইনজীবীদের এক সমাবেশে এরশাদকে খুনি ও অবৈধ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ঢাকায় সর্বত্র প্রচার ও বিতরণ করা হয় "বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারদিক" শিরোনামে গণঅভ্যুত্থানের বুলেটিন। সারাদেশে বিক্ষোভ চলতে থাকে এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে।

সারাদেশে ৩ ডিসেম্বর ১৯৯০ তিনজোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহুত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। সরকার বিধিনিষেধ শিথিল করা সত্ত্বেও এদিনও সাংবাদিকরা পত্রিকা প্রকাশে অনীহা ব্যক্ত করেন। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক, বুদ্ধিজীবি এবং ছাত্র শ্রমিক জনতার বিক্ষোভ মিছিল সারা ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এদিন বিসিএস (প্রশাসনিক) ক্যাডারের ২০৫ সদস্য পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। সরকারের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করা ৫৮টি এনজিও সরকার বিরোধী চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ততা ঘোষণা করে। জাতিসংঘের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকায় জাতিসংঘের সব কার্যক্রম ও দফতর বন্ধ ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রামে ১ জন ও চাঁদপুরে ১ জন হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে চাঁদপুরের ডেপুটি কমিশনার পদত্যাগ ঘোষণা করেন। রাতে এরশাদ এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের ১৫ দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। ৮, ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐকার নেতারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এরশাদের এ প্রস্তাব। [৬৫]

৪ ডিসেম্বর ১৯৯০ সকালে লাখ লাখ রাজনৈতিক নেতাকর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী লোক সংগঠনসমূহের নেতাকর্মী এবং ছাত্রশ্রমিক জনতার বিক্ষোভ মিছিলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তা ভরে ওঠে। সারাদেশে বিভিন্ন শহরে ও গঞ্জে এরশাদের কুশপুত্তলিকা দাহের ঘটনা ঘটে ব্যাপক হারে। এদিন ঢাকায় সিভিল সার্ভিস সমন্বয় পরিষদের সদস্যরা সচিবালয় ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন। পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন বিসিএস

(প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। এদিন বিকালে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় ঢাকায় পৃথক পৃথক সমাবেশে এরশাদের আগের দিনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে তখনি তার পদত্যাগ দাবি করে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতারাও একই দাবি জানায়।[৬৬]

৪ ডিসেম্বর রাত ১০টার সংবাদের সময় এরশাদ সাহেবের। অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জরুরি অবস্থার আইন ও কারফিউ উপেক্ষা করে লাখ লাখ মানুষ আনন্দ-উল্লাসে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং গভীর রাত পর্যন্ত চালে হাজার হাজার মানুষের বিজয় মিছিল।[৬৭]

৫ ডিসেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট সর্বসম্মতভাবে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করে। এদিন এরশাদ চতুর্থ সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন।

৬ ডিসেম্বর সকালে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। অতঃপর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। তারপর এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় ৯ বছরের স্বৈরশাসনের পতন ঘটে।[৬৮]

এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের এ পতনের মূলে ছিল ও জোট (৮, ৭ ও ৫) দলের প্রত্যক্ষ ভূমিকা। এ আন্দোলনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ এতই ব্যাপক ছিল যে, পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীর সদস্যরা পিছু হটতে শুরু করে। সেনাবাহিনীও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৬৯]

এভাবে এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলগুলো ছাত্র-জনতার সহায়তা ও সমর্থনে ধারাবাহিক প্রতিবাদ ও আন্দোলন চালিয়ে স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামল অতিবাহিত করে এবং পরিশেষে এরশাদের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে।

৫.৫ উপসংহারঃ

এরশাদ সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ভারত উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ শাসন ও পাকিস্তানী স্বৈরশাসন বিরোধী সংগ্রামী রক্তধারা। বাংলাদেশ সেই ১৭৫৭ সাল থেকেই বিভিন্ন সময়ে , সিপাহী বিপ্লব, অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশ আন্দোলন পাকিস্তান আন্দোলন, আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন তথা ছয় দফায় আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম করে এসেছে। গণমাণুষের মুক্তির চেতনার বীজ এদেশের মানুষের রক্তে মাংসে সদাজাগরুক, তারই ধারাবাহিকতায় ৯০এর গণঅভ্যুত্থান ও এরশাদশাহীর পতন। নিঃসন্দেহে এটা গণতন্ত্রকামী স্বাধীনচেতা বাঙ্গালীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেরই ফসল।[৭০]

পাদটীকাঃ

১. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ ৩৬৫-৩৬৭।

২. ফিরোজ বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা কারুলী প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার, সেপ্টেম্বর ২০০৩,পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০।

৩. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, ঢাকা নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ: ৩৮৭ ।

৪. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকার আজিজিয়া বুক ডিপো, ১৯৮৯, ৫৪৮-৫৪৯।

৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ নভেম্বর ১৯৮২।

৬. এম ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৫।

৭. ইউসুফ মোহাম্মদ সম্পাদিত অ্যালবামঃ গণআন্দোলন ১৯৯২, ১ম খন্ড তোলপাড়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮২-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩১৬।

৮. আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস, ঢাকাঃ১৯৮৮, পৃঃ ৪৪-৪৫।

৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ৩ এপ্রিল ১৯৮৩।

১০. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৮৩।

১১. এমএ ওয়াজেদমিঞা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৭।

১২. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৩।

১৩. এমএ ওয়াজেদ মিঞা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮।

১৪. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৫২।

১৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ১৩ জানুয়ারী ১৯৮৪।

১৬. এম ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯।

১৭. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ৩ এপ্রিল, ১৯৮৪।

১৮. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ২ মে ১৯৮৪।

১৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২৭মে ১৯৮৪।

২০. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকাঃ ৬ জুন থেকে ১ সেপ্টেম্বর।

২১. এমএ ওয়াজেদ মিঞা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৩।

২২. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

২৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ এপ্রিল ও ড. মুহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

২৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২ মার্চ ১৯৮৫।

২৫. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস নওরোজ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৮, ১৪৬ ২৬. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, ঢাকাঃ হাসিনা প্রকাশনী, পৃঃ-৩২৪।

২৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২৪ জুলাই ১৯৮৫।

২৮. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ১৭ আগষ্ট ১৯৮৫।

২৯. এম এ ওয়াজেদমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৬।

৩০. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২২ মার্চ ১৯৮৬।

৩১. মোঃ খুশবু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, এরশাদের সময় কাল, ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ পৃঃ৪০-৪৩

৩২. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ৫ মে ১৯৮৬ ।

৩৩. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ পৃঃ ১৮-১৯৯।

৩৪. জালাল ফিরোজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৯

৩৫. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, প্রাগুক্ত, ঢাকাঃ আজিজয়া বুক ডিপো, ২০০৪, পৃঃ ১৭৬।

৩৬. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, প্রাগুক্ত, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৪, পৃঃ ১৭৭।

৩৭. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ২৪ অক্টোবর ১৯৮৬।

৩৮. দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ১৫ জুলাই, ১৯৮৭।

৩৯. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৭।

৪০. আবু নাসের টুকু রাখী বর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২।

৪১. মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

৪২. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২৭ জানুয়ারি ১৯৮৮।

৪৩. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪১।

৪৪. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪১।

৪৫. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২, দৈনিক সংবাদ, ঢাকাঃ ৮-১৩ জুন।

৪৬. দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকাঃ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

৪৭. এমএ ওয়াজেদমিয়া, প্রাগুক্ত, ৩৭২।

৪৮. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ২৯ জুন, ১৯৮৯।

৪৯. এম এ ওয়াজেদমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭২

৫০. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখী বর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২-১৮৩।

৫১. মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬-৯৭।

৫২. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫ ৫৩. এমএ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫।

৫৪. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২-১৬৩।

৫৫. সাপ্তাহিক ছুটি, বর্ষ ৬ সংখ্যা ৪০, ১৯ অক্টোবর, ঢাকা ১৯৯০, ১১ ৫৬. মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১।

৫৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাদিত), গণআন্দোলন, ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৯১, পৃঃ-১৬৮।

৫৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসানাত (সম্পা) ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৯১ পৃঃ ১৩০।

৫৯. মোহাম্মদ খুশবু, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬।

৬০. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক খবর, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ৯-১২ নভেম্বর ১৯৯০।

৬১. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০।

৬২. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকাঃ ২০ নভেম্বর ১৯৯০

৬৩. এমাজউদ্দিন আহম্মদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, ঢাকাঃ শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৩, পৃঃ ৬১-৬৬

৬৪. মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৯১, পৃঃ ১৬১-১৬৩।

৬৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২০ নভেম্বর ১৯৯০।

৬৬. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৫।

৬৭. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বাংলাদেশ পুণর্গঠন ও জাতীয় ঐক্যমত, ঢাকাঃ দি ইউনির্ভার্সিটি প্রেস লি: **১৯৯১**, পৃঃ২৭৬।

৬৮. তমিজউদ্দিনআহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

৬৯. Talukder Moniruzzaman, Polities and Security of Bangladesh, Dhaka: University Prass Ltd., 1994, P. 143

৭০. মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, **১৯৮৯**, পৃঃ ৫৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক পরিবর্তনঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

৬.১ সূচনাঃ

গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতনের পর তিন জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে মনোনীত করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফলে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ হন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পরই শাহাবুদ্দীন আহমদ সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন এবং সে ব্যাপারে সকলে সহযোগিতা কামনা করেন। এরপরও জনতার বিজয় উল্লাসে ঢাকাসহ সমগ্র দেশ ছিল উৎসবমুখর। জনতার এ বিজয় উল্লাস যাতে বিশৃঙ্খলায় রুপ না নেয় সেজন্য জোট নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করেন এবং জনগনকে স্বৈরাচারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহবান জানান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আরও ঘোষণা করেন যে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানই তার সরকারের প্রধান দায়িত্ব এবং এজন্য বিশেষ করে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক বলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মনে করেন।

ক) দেশে অবশ্যই শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হবে আর এজন্য ছাত্র সমাজসহ সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

খ) সময়মত সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যথাযথ নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রয়োজন।

গ) জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ না থাকায় সরকারী দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করণ প্রয়োজন যার সদস্যবর্গ হবেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ এবং তারা আগামী নির্বাচন এমনকি এক বছরের মধ্যে কোন উপনির্বাচনে ও প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত উপরিউক্ত তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করার পরই মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ১৭ জন প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে এক উপদেষ্টা পরিষদ তিনি গঠন করেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপরিউক্ত বক্তব্য ও কর্মকান্ড হতে এটা নিশ্চিত ভাবে প্রকাশিত হয় যে, তিনি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর, সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন এবং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচনী তফসিল ও নির্বাচনের তারিখ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তার বিভিন্ন বিবৃতি ও ভাষণে বারবার বলেন, আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা বা বিঘ্ন সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টা কে কঠোর ভাবে দমন করা হবে। তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে কোন রাজনৈতিক দলের নির্দেশে গুন্ডামি অথবা অসদুপায় অবলম্বন তার সরকার সহ্য করবেনা। নিবার্চনী অপরাধের সাথে জড়িত হলে সরকারী কর্মচারীদের রুিদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। সে সাথে তিনি আইন শৃঙ্খলা

রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বেআইনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন্ তিনি প্রার্থীদের দৈনন্দিন নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার নির্দেশ দেন। সরকারী কর্মকর্তাদের ও তাদের কতর্ব্য সম্পাদনকালে আইনের শাসন মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানান। [১]

এরশাদের পতনের পর দেশের রাজনৈতিক জোটগুলি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়েছে এবং সফলতা অর্জন করেছে। দীর্ঘদিনের নির্বাচন নামক প্রহসন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার পর এরূপ সাফল্য জাতির জন্য অবশ্যই গৌরবের বিষয়।[২]

৬.২ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনঃ

এরশাদ সরকারের পতনের পর দেশের বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জ উত্তরনের প্রথম রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল বেসামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন। ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯০ এরশাদ অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী হবার পরপরই তিনজোট নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করে। এই আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরদিন ৪ঠা ডিসেম্বর প্রথমে তিনজোট পৃথক পৃথকভাবে বসবে, পরে একসঙ্গে লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এ আলোকে পরদিন কাল ১১টায় জাসদ কার্যালয়ে ৫ দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৫ দল বৈঠকে কোন নাম নিয়ে আলোচনা না করে বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে দুটি শর্ত পুরণ করতে হবে। প্রথমত, সরকার প্রধান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী হবেন না। দ্বিতীয়ত, বর্তমান সরকারের সঙ্গে কোনভাবেই তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন থাকা চলবেনা। ৮ দল তাদের জোটের বৈঠক করে ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে। জোটের ঐ সভায় নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নির্ধারণে মুলত বিভিন্ন মহলকে তার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়। গণতন্ত্রী পার্টির তো সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সেক্ষেত্রে দাতা দেশগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এবং সামরিক বাহিনীর গ্রহনযোগ্যতা বিবেচনায় নিতে বলেন। এই আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) খন্দকারের নাম প্রস্তাব করা হয়। তবে এ ব্যাপারে আওয়ামীলীগের কয়েকজন নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ করলে সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়। সভানেত্রী বলেন, লিয়াজোঁ কমিটির আলোচনায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। ৭ দলের বৈঠক হয় মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য বিএনপি নেতা জুলমত আলী খানের বাসভবনে ঐ বৈঠকে বেগম জিয়া ৫ দলের দুটি শর্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে তাঁর দলের নেতৃবৃন্দকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। দুপুর দুটো থেকে বাকশালের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদের বাসভবনে প্রথমে ৮ দল তারপর ৫ দল এবং সবশেষে ৭ দল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। ৮ দলের পক্ষ থেকে আবদুল মান্নান, আবদুসসামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমেদ, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, আব্দুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত প্রমুখ ৫ দলের পক্ষে নির্মল সেন, রাশেদ খান মেনন, মঈনুদ্দিন আহমদ খান বাদল, আকবর হায়দার খান রনো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং ৭ দলীয় জোটের পক্ষে মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজেদুল হক, মান্নান ভূইয়া, আবদুল মতিন চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনজোটের আনুষ্ঠানিক বৈঠক শুরু হবার আগেই জোটসমূহের নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করেন। এ সময় সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে বলেন প্রধান বিচারপতিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করা হবে সাংবিধানিক জটিলতা দেখা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়টি আইন জীবিদের গোচরে আনা হয়। এই সময় জোটের বৈঠকে উপস্থিত হন ডা: কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। তাঁরা জানান প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করে দাযিত্ব গ্রহণ করা সাংবিধানিক ভাবে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করবে না। এরপর ব্যারিস্টার আমীর উর ইসলাম এবং নাজমুলহুদা উপস্থিত হন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতৃবন্দ লিয়াজোঁ বৈঠকে উপস্থিত হন জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, নূর আহমেদ বকুল প্রমুখ। এরা জোটের নেতৃবৃন্দ কে জানিয়ে দেন ৭১ এর রাজাকার এবং স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগী কাউকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করা যাবেনা। এর কিছুক্ষণ পরই ডঃ কামাল হোসেন সহ আইনজীবীরা ৩২ নম্বরে শেখ হাসিনার সঙ্গে এ

বিষয়ে কথা বলতে যান। মান্নান ভূইয়া এবং আওয়ামীলীগের আবদুর মান্নান যান বেগম খালেদা জিয়ার কাছে। কিন্তু চারটা কুড়ি মিনিটে শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন, তিনজোট নেতৃবৃন্দ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সিদ্ধান্ত দেবন এটা আমাদের প্রত্যাশা। তিনি লিয়াজোঁ নেতৃবৃন্দকে জানান ৭১ এর ৮২'র দালালদের কোনভাবেই তত্ত্বাবধায় সরকার প্রধান করা যাবেনা। এ সময় জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, খায়রুল কবীর খোকন প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে হাসিনার সিদ্ধান্তের অভাবে জোটের বৈঠকে অচলাবস্থা দেখা দেয়। এ সময় ৫টা ৩০ মিনিটে খবর পাওয়া যায় হাসিনা শিঘ্রই ৩২ নম্বরে ফিরবেন। ঠিক এই সময়েই শুরু হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নির্ধারণের গণবিতর্ক। এ সময় ৫ দলের পক্ষ থেকে মঈনুদ্দিন আহমেদ খান বাদল নাম প্রস্তাব করেন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের। ৮ দলের নেতা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এর বিরোধীতা করে বলেন আপনারা যদি কামাল উদ্দিন হোসেন এবং বদরুল হায়দার চৌধুরীর না বলতেন তাহলে এ নিয়ে আলোচনা করা যেত, কিন্তু চীফজাস্টিস কে করার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সমস্যা আছে। তিনি পাল্টা হিসেবে এ কে খন্দকারের নাম প্রস্তাব করেন কিন্তু তাৎক্ষণিক ভাবে ৭ ও ৫ দল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আমির হোসেন আমু তখন প্রস্তাব করেন দুটি নাম নিয়ে বির্তক হয়েছে তাই নতুন নাম প্রস্তাব করা হোক। এ সময় নেতৃবৃন্দের মধ্যে যখন উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়, সে সময় আমানউল্ল্যাহআমানের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি বিরাট মিছিল আসে। আমান, খোকন, শফি, টিংকু, বাবুল, নাসির প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন আপনারা ৬টার মধ্যে নাম দিতে চেয়েছেন, নাম দিন, মানুষ উৎকণ্ঠিত, নাসিরউদ্দোজা বলেন নাম না দিলে কাউকে আমরা বের হতে দেবন না। এ সময় ঘড়ির কাটায় পৌনে ৭টা। তাঁরা এক ঘন্টার মধ্যে নাম দিতে বলেন, এ সময় বাইরে শ্লোগান ওঠে জনগণ নাম চায়। এই মুহুর্তে নাম দাও, তিনজোট এক হও। নেতৃবৃন্দ ঘেরাও অবস্থায় শাহাবুদ্দিন আহমেদের নাম চূড়ান্ত করেন ৭টা ৪০ মিনিটে। সিপিবির মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ঘোষণা পাঠ করেন। এরপর শেখ হাসিনার কাছে যান নেতৃবৃন্দ। হাসিনা টেলিফোনে শাহাবুদ্দিন বিচারপতিকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালে তিনি একটি শর্ত সাপেক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর আমি আমার প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যাবো। তিন জোটের নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে তার এই শর্ত মেনে নেন।[৩]

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হবার পর মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ১৭ জন প্রবীণ অভিজ্ঞ এবং নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে এক উপদেষ্টা পরিষদ তিনি গঠন করেন। ৯ ডিসেম্বর ৬ জন সদস্য এ পরিষদের সদস্য হন। পরবর্তীতে আরও ১১ জন সদস্যকে তিনি উপদেষ্টা পরিষদে মনোনয়ন দান করেন। তিন দলীয় জোট হতে পেশকৃত তালিকায় যে ৩১জন ব্যক্তির নাম ছিল তাদের মধ্যে হতে তিনি ১৭ জনকে বাছাই করেন। নিম্নে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নাম দেয়া হলো:-

নাম	**মন্ত্রণালয়**
১. বিচারপতি এম এ খালেক	আইন, বিচার, এবং সংসদীয় বিষয়
২. জনাব কফিলউদ্দিন মাহমুদ	অর্থ

৩. জনাব ফখরুদ্দীন আহমেদ	পররাষ্ট্র
৪. অধ্যাপক রেহমান সোবহান	পরিকল্পনা
৫. অধ্যাপক ওয়াহিদুলীন আহমদ	জ্বালানী খনিজ সম্পদ এবং পুর্তকর্ম
৬. অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	শিক্ষা
৭. জনাব আলমগীর এম এ কবীর	সমাজ কল্যাণ মহিলা বিষয়ক এবং যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া
৮. জনাব এম কে এম মুসা	শিল্প, পাট ও বস্ত্র পরিবেশ বন মৎস্য ও পশু সম্পদ
৯. অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ	সংস্কৃতি ও খাদ্য
১০. জনাব এবিএম জিকিবরিয়া	যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগ
১১. জনাব ইমামউদ্দীন আহমদ	বাণিজ্য
১২. জনাব বি কে দাস	ত্রাণ ও পূর্ণবাসন
১৩. জনাব এম আনিসুজ্জামান	কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা
১৪. চৌধুরী এম এ আমিনুল হক	শ্রম জনশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ।[৪]

সামরিক সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বের অন্যন্য সামরিক শাসকের মত এরশাদের পতনের পর এদেশে গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জ উত্তরণের নিমিত্তে নানাবিধ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে এবং দেশ পুনরায় বেসামরিকীকরণের পথে অগ্রসর হয়।

৬.৩ নির্বাচন ১৯৯১ এবং গণতান্ত্রিক সুশাসনের পথে পদক্ষেপঃ

এরশাদ সরকারের বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এদেশের মানুষ সফল হয় এবং তার পতন ঘটায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত রাষ্ট্রপরিচালনায় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কার্যকালের এই সংক্ষিপ্ত সময়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, ১৯৯০ এর ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংবিধান অনুযায়ী তিনি ছিলেন একাধারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। দ্বিতীয় ১৯৯১ এর ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকা।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ স্বল্পকালীন সময়ের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই তিনি ১৯৯০ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রথমে গোপালগঞ্জের টুংঙ্গিপাড়ায় বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জেয়ারত করেন এবং পরে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্প অর্পন করেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষনে বলেন তাঁর মুল কাজ হবে অতিশীঘ্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করা। তিনি সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। প্রথমে ১৯৯১ সালের ২ মার্চ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে এই তারিখ পরিবর্তিত হয়ে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়।

১৯৯১ সালের ১ জানুয়ারী জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী নির্বাচনে অংশগ্রহনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৯১ সালের ৭ জানুয়ারী আওয়ামীলীগ সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৯১ সালের ৯ জানুয়ারী বাকশাল সংসদ নির্বাচনের জন্য ২৪৮টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। ১১ জানুয়ারী জাতীয় পার্টি ২৬৮টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে।

১৯৯১ এর ১৩ জানুয়ারি ছিল মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন। এই দিন তিন সহস্রাধিক মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়। নির্বাচনের খালেদা জিয়া ৫টি আসনে, এরশাদ ৫টি আসনে এবং শেখ হাসিনা ৩টি আসনে প্রার্থী হন। মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশন ১৪ জানুয়ারি ৩৭৬৪ টি মনোনয়ন পত্র বৈধ বলে ঘোষণা করেন|

১৯৯১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ রেডিও টিভিতে এক ভাষণে বলেন, এবারের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে বাধ্য। প্রধান নির্বাচন কমিশনও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

১৯৯১ এর ২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নৌকা প্রতীক গ্রহণ করে এবং সবকটি আসনেই প্রার্থী মনোনয়ন করে। তবে আওয়ামীলীগ ও ৮ দলীয় ঐক্যজোটের মধ্যে আসন বন্টন নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে আওয়ামীলীগ বেশ কিছু আসন ৮ দলীয় জোটের শরীক দলগুলোকে ছেড়ে দেয়। উক্ত আসনগুলোতে ন্যাপ, গণতন্ত্রী পার্টি, সিপিবি বাকশাল প্রভৃতি দল নৌকা প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ করলেও এসব দলের অনেক প্রার্থীই বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে নৌকা প্রতীকে বিরুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়।

নির্বাচনে বিএনপি ধানের শীষ জামায়াতে ইসলামী দাড়িপাল্লা ও জাতীয় পার্টি লাঙ্গল প্রতীক গ্রহণ করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে সর্বমোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭৭৪ জন। ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ছয় কোটির উপর। তবে সর্বমোট ৩৩,০৮৮,৫৬০ জন ভোটার ভোট প্রদান করে। জাতীয় সংসদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২ জন প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে ২টি আসনে নির্বাচন স্থগিত থাকে। নির্বাচনে শতকরা ৫২.৩৭ ভাগ ভোটদাতা ভোট দান করে। দলগতভাবে জাতীয়তাবাদী দল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩১.৪৪ ভাগ লাভ করে এবং আওয়ামীলীগ শতকরা ভোটের ৩১.১৩ ভাগ লাভ করে। একাধিক আসনে জয়ী প্রার্থীদের পরিত্যক্ত আসনগুলিতে এবং প্রার্থীদের মৃত্যুজনিত কারণে শূন্য হওয়া ১১টি আসনে ১৯৯১ এর ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯১ এর ২৭ ফেব্রুয়ারী ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সর্বাধিক আসন লাভ করে এবং ৮৮টি আসন অর্জন করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আওয়ামীলীগ দল জাতীয় পার্টি লাভ করে ৩৫টি আসন এবং জামায়াত ১৮টি আসন লাভ করে বাকি আসনগুলো লাভ করে অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এই নির্বাচনে কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হননি।

১৯৯১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ১১টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপনির্বাচনে বিএনপি ৫টি জাতীয় পার্টি ৪টি এবং আওয়ামীলীগ ২টি আসন লাভ করে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিএনপি ২৮টি এবং জামাতে ইসলামী ২টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৭৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১২টি দল সংসদে আসন লাভ করে। বাকি ৬৪টি দল কোন আসন লাভ করতে সক্ষম নাই। সকল বিরোধী দল মিলে সংসদে বিরোধী আসনসংখ্যা দাড়ায় ১৬০টি।

১৯৯১ সালে ৯ মার্চ সংসদের ৪টি আসনের স্থগিত কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে আওয়ামীলীগ ৩টিতে এবং বিএনপি ১টিতে জয়লাভ করে। ১১ মার্চ ১৯৯১ জামায়াতের এক প্রতিনিধিদল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে বিএনপি কে সমর্থন দানের কথা ব্যক্ত করেন।

১৯৯১ এর ১৪ মার্চ মুন্সিগঞ্জ ৩ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের বিএনপি প্রার্থী বিজয়ী হন।

১৯৯১ এর **১৫** মার্চ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। **১৮** মার্চ তিনি ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দকে বঙ্গভবনে গোলটেবিল বৈঠকের আহবান জানান। ৮ দল ও ৫ দল উক্ত বৈঠকে যোগদানের সম্মতি জ্ঞাপন করলেও ৭ দলীয় জোট এই বৈঠকে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়।

১৯ মার্চ **১৯৯১** এ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদ খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে **১০** জন পূর্ণমন্ত্রী ও **২১** জন প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ দীর্ঘ **১৬** বৎসর পর গণতান্ত্রিক সুপরিচালনের পথে নতুন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৫]

৬.৪ উপসংহারঃ

একাত্তরে এই ভূখণ্ডের সংগ্রামী মানুষ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক হয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যে লালিত যে আশা আকাঙ্খা জনগণের মনে জাগ্রত হয়েছিল একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় দিবসের বিপ্লব আনন্দ উল্লাসে। তা বিভিন্ন সময়ে হোচট খেয়েছে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে এদেশে স্বৈরশাসন কায়েম করে। যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। বেসামরিকীকরণ গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাড়ায়। তাই স্বৈরাচারী সরকারের পতনের লক্ষ্যে জাতি আবার ইস্পাত কঠিন ঐক্যে উপনীত হয়েছিল ১৯৯০ সালে। ১৯৯০ এর বিজয় দিবস এসেছে তাই ভিন্ন রূপে। নতুন প্রজন্ম যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও তার বিজয়ের আনন্দ উপলব্ধি করার সুযোগ পায়নি, তাঁরা আজ নতুন করে বিজয় দিবস পালন করলো। এ বিজয় স্বৈরশাসনের পতনের বিজয়, এ বিজয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংগ্রামী জনতার বিজয়, অভূতপূর্ব এ বিজয় মিছিলে ভরে গেছে রাজধানী, রাজধানীর বাইরে শহর, বন্দর ও গ্রাম গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে ভেসে গেছে রাজপথ। শ্বাসরুদ্ধকর স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশ অবসান ঘটেছে এসেছে মুক্ত পরিবেশ। গঠিত হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং তার অধীনে ১৯৯১ সালে হয় পুনঃগণতন্ত্রায়নের পথে এগিয়ে যাবার নির্বাচন। এরশাদ স্বৈরসরকারের নির্মীত বেসামরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়নের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে এসেছে তা বাঙালীর সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় যুক্ত করেছে দুর্বার বাঙালীর আরেক ইতিহাস। সেই ইতিহাস জনগণের দীর্ঘকালের স্বপ্ন গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির।

স্বাধীনতার বেদীমুলে যে ত্রিশ লক্ষ জীবন শহীদ হয়েছিল তাঁদেরই পবিত্র রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমান। জাতি সেই অগণিত শহীদের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে আছে। দীর্ঘ স্বৈরশাসনের নিগড় ভেঙ্গে জনতার শক্তির নব উত্থান ঘটেছে। ১৯৯০ এর বিজয় হয়ে উঠেছে মুক্ত মানুষের কল্লোলে মুখরিত, বিজয়ের এই আনন্দের অন্তর্নির্হিত চেতনার শক্তি, সংগ্রামী প্রেরণা নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। তবেই গণতন্ত্রায়নের পথে দেশ এগিয়ে যাবে।

জনতার দুর্বার সংগ্রামের মুখে সমূলে পতন হয়েছে স্বৈরাচারী এরশাদের। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে যেমন এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, এবারের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমেছে গুলীবর্ষণের মুখে কারফিউ ও জরুরী আইন ভঙ্গ করেছে। স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে। সংগ্রামী জনগণ প্রমাণ করেছে ক্ষমতার সকল উৎস জনগণ, অস্ত্র নয়। শত শহীদের রক্তস্নাত গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় হয়েছে।

বাঙালী জাতির আজ এক ঐতিহাসিক সুযোগ উপস্থিত। দেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভিত্তিক সমাজ নির্মাণই ছিল এবারের গণসংগ্রামের ঘোষিত লক্ষ্য। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জবাবদিহিতামূলক সরকার ক্ষমতায় বসবে, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য সংযম ও অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলেই গণতন্ত্রের চর্চা করবেন। জনগণের বিজয়কে অব্যাহত রেখে দেশ গড়ার কাজে লাগাতে

হবে সকলকে একে অপরের প্রতি নোংরা মন্তব্যকরণ, কাদা ছোড়াছুড়ি, হিংসা বিদ্বেষ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত থেকে বিরত থাকতে হবে। তিন প্রধান রাজনৈতিক জোট ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসন হয়েছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সংসদের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা প্রতিরোধ আইনের শাসন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি কালাকানুন বাতিল এসব পূর্বশর্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার। ক্ষমতার প্রশ্নে গণতন্ত্র সম্মত রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকা স্বাভাবিক তাঁদের নিজ নিজ দলীয় আদর্শ প্রচারে অবতীর্ণ হবেন তারা সন্দেহ নেই কিন্তু এই প্রচার ভিযান অবশ্যই দেশও জাতির স্বার্থে গণতান্ত্রিক সহনশীলতা মূলক বিধি বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। এভাবেই দেশে গণতান্ত্রিক চর্চা ও জীবনাচরণকে স্থায়ী ভিত্তি প্রদান করে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রসারিত ও সুদৃঢ় করা সম্ভব। রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার সকল রাজনৈতিক দল সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক আচরণ বিধি অনুসরণ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবেন, এটাই আজ জনগণের প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে জাতির ভাগ্যে আবার নেমে আসবে অন্ধকার এই সতর্কবাণীর উচ্চারণ নিতান্তই সময়োপযোগী।[৬]

পাদটীকাঃ

১. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১ জানুয়ারী ১৯৯১।

২. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলা বাজার,সেপ্টেম্বর ২০০০ পৃঃ ২৬৭।

৩. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড মে, ১৯৯১, পৃঃ -১৭১-১৭৩।

৪. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো প্রকাশন এপ্রিল ২০০১, পৃঃ -৫৫৮।

৫. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃঃ ২৬৭-২৭০।

৬. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, মে ১৯৯১, পৃঃ-১৭৭-১৭৮।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যুগে-যুগে দেশে-দেশে ক্ষমতার মোহে স্বীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য বারবার স্বৈরশাসকের আবির্ভাব ঘটেছে। এসব একনায়করা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিরীহ নিরস্ত্র জনতার ওপর চালিয়েছে নির্বিচারে হত্যা, লুন্ঠন ও নির্যাতনের স্টিম রোলার। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত ও দীর্ঘায়িত করার জন্য এহেন অপকর্ম নেই যা তারা করেননি। সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও এ স্বৈরশাসকদের কারোরই শেষ রক্ষা হয়নি। যা ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়। পৃথিবীর দেশে দেশে এক নায়কতন্ত্রের শেষ পরিনতি যা হয় বাংলাদেশের রাজনীতিতেও তাই ঘটলো **১৯৯০** এর ডিসেম্বরে।

১৯৮২ থেকে **১৯৯০** সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এরশাদ সরকারের স্বৈরশাসন নানাবিধ কারণে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে আলোচিত অধ্যায়। নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে এই স্বৈরশাসকের উত্থান হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এ সামরিক শাসন অভিশাপ হয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিকে কলুষিত করে। মূলতঃ সামরিক শাসন কখনই শুভ ফল আনয়নে সক্ষম হয় না। সামরিক শাসন ভাই বার বার বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিকৃত করেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কার্যকর সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ **১৯৮২** সাল থেকে **১৯৯০** সাল পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন কতৃত্ববাদী এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিল নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক শক্তিগুলোর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা।

১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরেই সামরিক বাহিনীর তদানিন্তন প্রধান এরশাদ বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্ব চালু করেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সে তত্ত্ব মেনে না নিলেও তিনি সেই তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার জন্য নির্বাচিত সরকারকে সরিয়েদিয়ে ক্ষমতা দখল করে সেই ক্ষমতাকে রাজনৈতিক বৈধতা দেয়ার জন্য জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং **১৯৮৬** সালে তিনি নিজেকে সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। কিন্তু এ নির্বাচনগুলো ছিল এক প্রকার প্রহসনমূলক। রাষ্ট্রপতির গদি আঁকড়ে থাকলেও এরশাদের শাসনের পিছনে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ছিল না, ছিলনা কোন প্রকার বৈধতা, সাধারণ মানুষেরা কাছে তিনি বরাবরই ছিলেন ঘূর্ণিত এক ক্ষমতা জবরদখলকারী।

এরশাদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর ওই বছরের শেষার্ধেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন দাবি নাওয়ানিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও যোগাযোগ শুরু হয়। আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে বাংলাদেশের জনগণের, বিরোধী জোট ও দলগুলো নেতৃত্ব দিয়ে সামরিক শাসনের পতন ঘটিয়েছে।

যদিও এরশাদের চাতুরতা ও বিরোধী দলগুলোর দূরদর্শিতার অভাব এবং পারস্পরিক অবিশ্বস্ততার কারণে এরশাদ দীর্ঘ ৯ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকতে সমর্থ হয়। তথাপি বিশ্বের অন্যান্য স্বৈরাচারী এক নায়কদের মতো করুণ পরিণতি এরশাদের ক্ষেত্রেও আমরা ঘটতে দেখেছি। এরশাদের এ পতনের পেছনে মূল ভূমিকায় ছিলেন বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলগুলো। বিরোধী জোট ও দলগুলোর পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে ১৯৯০ সালের বিরোধী তিন জোটের ঐতিহাসিক রূপরেখা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতির বিজয় সূচিত হয়েছে। এই গণআন্দোলনের রূপরেখা অনুযায়ী বিরোধী দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বলেই দেশের ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, তথা আপামর জনসাধারণের সমর্থনে সফলকাম হয়।

৩ জোটের রূপরেখা অনুযায়ী ১৯৯০ সালে ৫ ডিসেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। অবসান ঘটে এরশাদ সরকারের নয় বছরের স্বৈরশাসনের। বিজয় সূচিত হয় সংগ্রামী বিরোধী জোট ও জনতার।

জনতার দুর্বার সংগ্রামের মুখে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে স্বৈরাচারী এরশাদ। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে যেমন এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমেছে। গুলিবর্ষণের মুখে কারফিউ ও জরুরী আইন ভঙ্গ করেছে। স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে। সংগ্রামী জনতা প্রমাণ করেছে ক্ষমতার সব উৎস জনগণ অস্ত্র নয় শত শহীদের রক্তস্নাত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় হয়েছে। ১৯৯০ এর ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ সামরিক শাসনের শিকল ছিন্ন করে বিশ্বের দরবারে সম্মানজনক জাতি হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যত বাঁধাই আসুক না কেন আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই তা সবাইকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতাদেরকে দেশপ্রেম, সততা ও জবাবাদিহিতার ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাদের সত্যিকার দায়িত্বশীলতার প্রমাণ রাখতে হবে। তবেই সফল হবে জনগণের গণতন্ত্রের স্বপ্ন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বইয়ের নামঃ

১.আমীর খসরু, রাজনীতির সামরিকীকরণ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের রাজনীতির ১৯৮২-৯০, ঢাকা: প্রকাশক এফ. রহমান, ১৯৯১, পৃ: ১৭-১৮।

২. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকাঃ নও রোড কিতাবিস্থান, ১৯৮৮, পৃঃ ১৭৩।

৩.আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস, ঢাকাঃ ১৯৮৮, পৃঃ ৪৪-৪৫।

৪.আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের নয় মাস নওরোজ প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৮, পৃঃ ১৪৬।

৫. আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৭, পৃঃ ১৭৭।

৬. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বাংলাদেশ পুণর্গঠন ও জাতীয় ঐক্যমত, ঢাকাঃ দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লি: ১৯৯১, পৃঃ ২৭৬।

৭. ইউসুফ মোহাম্মদ সম্পাদিত অ্যালবামঃ গণআন্দোলন ১৯৯২ ১খন্ড তোলপাড়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮২-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩১৬।

৮. ইউসুফ মুহাম্মদ সম্পাদিত, অ্যালবামঃ গণআন্দোলন (১৯৮২৯-১৯৯০) ১ম খন্ড, তোলপাড়, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩,পৃঃ ৫।

৯.এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ:৩৯।

১০.এমাজ উদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি:, ১৯৬৪, পৃ: ১০।।

১১.এমাজ উদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি:, ১৯৬৪, পৃ: ৪৭২।

১২. এমাজউদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৬৪, পৃ: ৬৫।

১৩. এমাজউদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৬৪, পৃ: ১২২।

১৪. এমাজউদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৬৪, পৃ: ৪৭।

১৫. এমাজউদ্দিন আহম্মদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, ঢাকাঃ শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৩, পৃঃ ৬১-৬৬।

১৬. এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, প্রকাশক শেখ মুহম্মদ ইসমাইল হোসেন, ঢাকাঃ ১৯৯১।

১৭. এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৬৪, পৃঃ ৫৭। ১৮. এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৮৪, পৃঃ ৫৭-৫৮।

১৯. এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮। ২০. এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৬৪, পৃঃ ৫৮-৫৯।

২১. এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৬৪, পৃঃ ৫৯।

২২.এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৬৪, পৃঃ ৬০।

২৩.এমাজউদ্দিন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৬৪, পৃঃ ৬৪।

২৪. এলাহিনেওয়াজ খান সম্পাদনায়, এরশাদের উত্থান পতন, ঢাকাঃওয়েসিসবুকস, ১৯৯১, পৃঃ ৪।

২৫. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ পৃঃ ৯৮-১৯৯।

২৬. ফয়েজ উদ্দিন আহম্মেদ, ৫ শতকের স্মৃতিকথা, ঢাকাঃ পরমা প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃঃ ৯।

২৭. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃ: ২৫৮-২৫৯।

২৮. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃঃ ২৪৮।

২৯. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, কাকলী, প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকাঃ সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃঃ২৫৯-২৬০।

৩০. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলা বাজার, সেপ্টেম্বর ২০০০ পৃঃ ২৬৭।

৩১. ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃঃ ২৬৭-২৭০।

৩২.মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, এপ্রিল ২০০১, পৃ: ৪৮১।

৩৩. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, আগষ্ট ১৯৯১, পৃ:৭।

৩৪. মেজর রফিকুল ইসলাম, স্বৈরশাসনের ৯ বছর, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯১, পৃঃ ৩৬।

৩৫. মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, স্বৈরশাসনের ৯ বছর ১৯৮২ থেকে ৯০, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১, পৃঃ ৩৪-৩৭। ৩৬. মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৭।

৩৭. মওদুদ আহম্মেদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১ অক্টোবর, ১৯৯৪।

৩৮. মেজররফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ৪৭।

৩৯. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯১, পৃঃ ২।

৪০. মোস্তফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

৪১. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৪, পৃঃ ১৭৬

৪২. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো ২০০৪, পৃঃ ১৭৭।

৪৩. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, পৃঃ ১৮২,

৪৪. মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৯১, পৃঃ ১৬১-১৬৩।

৪৫. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখী বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, পৃঃ ১৮২-১৮৩

৪৬. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, প্রাগুক্ত, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃঃ -৮৬। ৪৭. মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৯-৬০।

৪৮. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, সামরিক জান্তার রাজনীতি, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃঃ ১১৯-১২০।

৪৯. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ১৯৯১, পৃঃ ৭৭।

৫০. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলাবাজার, পৃ: ৫৫১-৫৫৫।

৫১. মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত-কুমার রায় বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা। ১৯৯৫, ঢাকা ১৪৩। ৫২. মুনতাসির মামুন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।

৫৩. মাহমুদ শফিক, মিডলম্যান আমলাতন্ত্রের বিস্তার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, আগস্ট ২১, ১৯৮৭।

৫৪. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলাবাজার, পৃ: ৫৫০-৫৫৫।

৫৫. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, ১৯৮৯, পৃঃ ৫৪৮-৫৪৯।

৫৬. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, ১৯৮৯, পৃঃ ৫৪৮।

৫৭. মোঃ খুশবু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, এরশাদের সময়কাল, ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, পৃঃ ৪০-৪৩।

৫৮. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ ইউনির্ভাসির্টি প্রেস লিমিটেড মে ১৯৯১, পৃঃ ১৫৬।

৫৯. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃইউনির্ভাসির্টি প্রেস লিমিটেড, মে ১৯৯১ পৃঃ ১৫৬।

৬০. মোঃ আব্দুল ওদুদ ভুইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, ১৯৮৯, পৃঃ ৫৫৫ ।

৬১, মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড মে, ১৯৯১, পৃঃ-১৭১-১৭৩।

৬২. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো প্রকাশন এপ্রিল ২০০১, পৃঃ -৫৫৮।

৬৩. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, মে ১৯৯১, পৃঃ-১৭৭-১৭৮।

৬৪. মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, ১৯৮৯, পৃঃ ৫৫৫ ।

৬৫. মুকিদুল হক, সংস্কৃতি বিন্যাসি স্বৈরাচার অভ্যুত্থান, পৃঃ১৩৫।

৬৬. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৬৭. রুহুল আমিন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারার নেতৃত্ব, ঢাকাঃ হিরা বুক মার্ট, ১৯৯৩, পৃঃ ১০।

৬৮. রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

৬৯. লন্ডন থেকে প্রকাশিত দি গার্ডিয়ান, ৭ অক্টোবর ১৯৮১ ও নিউইয়র্ক টাইমস, ১৪ অক্টোবর

৭০. শওকতআরা হোসেন, বিজ্ঞান দর্পণ, ঢাকাঃ ৩য় সংখ্যা ১৯৯২, পৃঃ ৩৬। ৭১. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাদিত) গণ আন্দোলন ১৯৮২-৯০, ঢাকা: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫-০৩-১৯৮২, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯১, পৃ:১২।

৭২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত (সম্পাদনায়) নব্বই এর অভ্যুত্থান, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৯১, পৃঃ

৭৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাদিত), গণআন্দোলন, ১৯৮২-৯০, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৯১, পৃঃ-১৬৮।

৭৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসানাত (সম্পা) ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৯১, পৃঃ ১৩০।

৭৫. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮।

৭৬. হারুন-অর- রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃঃ ৩৫৮।

৭৭. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃঃ-৩৬২-৩৬৪।

৭৮. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশের জন-প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের ক্রমবিকাশ, ঢাকাঃ হাসিনা প্রকাশনী, পৃঃ-৩৪১।

৭৯. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারের ক্রমবিকাশ, ঢাকাঃ হাসিনা প্রকাশনী, পৃঃ-৩২৪।

৮০. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃঃ-৩৪২।

৮১. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃঃ-৩৬১-৩৬২।

৮২. হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণঃ, ঢাকাঃ ইউপিএল,, ১৯৯২ পৃঃ-১০১।

৮৩. হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরনঃ, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯২ পৃঃ-১০১

৮৪. হাসানুজ্জামান, সাময়িক রাজনীতির চালচিত্র। বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকার আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩, পৃঃ ২৩-২৯।

৮৫. হাসানুজ্জামান, সামরিক রাজনীতির চালচিত্র। বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকাঃ আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৪-৩৭।

৮৬. হাসানুজ্জামান, সামরিক রাজনীতির চালচিত্র বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকাঃ আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩, পৃঃ ১২২।

৮৭. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০),ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, ৩৬৫-৩৬৭।

৮৮. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ: ৩৬৭।

পত্রিকার নামঃ

৮৯. একতা, ৫-১০-১৯৯০।

৯০।. একতা, ১৫-০৮-১৯৮৯।

৯১. একতা, ০৮-০৫-১৯।

৯২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ নভেম্বর ১৯৮২।

৯৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ৩ এপ্রিল ১৯৮৩ **।**

৯৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৮৩।

৯৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ১৩ জানুয়ারী ১৯৮৪।

৯৬. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬,

১৭. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ২ মে ১৯৮৪।

৯৮. দৈনিক ইত্তেফাকা, ঢাকাঃ ২৭মে ১৯৮৪।

৯৯. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকাঃ ৬ জুন থেকে ১ সেপ্টেম্বর

১০০. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ এপ্রিল ও ড. মুহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

১০১, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২ মার্চ ১৯৮৫। ১০২. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২৪ জুলাই ১৯৮৫।

১০৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২২ মার্চ ১৯৮৬।

১০৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ৫ মে ১৯৮৬।

১০৫. দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ১৫ জুলাই, ১৯৮৭। ১০৬, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২৭ জানুয়ারি ১৯৮৮।

১০৭. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক খবর, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ৯-১২ নভেম্বর ১৯৯০

১০৮. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকাঃ ২০ নভেম্বর ১৯৯০

১০৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকাঃ ২০ নভেম্বর ১৯৯০

১১০. দৈনিক বাংলা, ঢাকাঃ ২১ অক্টোবর, ১৯৮৬,

১১১. দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকাঃ ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

১১২. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ২৯ জুন, ১৯৮৯ ১১৩. দৈনিক সংবাদ, ২০ জুন ১৯৯১,

১১৪. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৩।

১১৫. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ৩ এপ্রিল, ১৯৮৪।

১১৬. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ১৭ আগষ্ট ১৯৮৫। ১১৭, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকাঃ ২৪ অক্টোবর ১৯৮৬

১১৮. পূর্বাভাস, (সাপ্তাহিক পত্রিকা) ঢাকাঃ, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৩, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

১১৯. সাপ্তাহিক কাগজ, ১ম বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ২১ অগ্রহায়ণ ৯৭, ১৬ই ডিসেম্বর ৯০।

১২০. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১ম বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৭ ডিসেম্বর ৯০/২২ অগ্রহায়ণ

১২১. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১ জানুয়ারী ১৯৯১।

আর্টিকেলঃ

১২২. গোপন সার্কুলার নং-১। এ প্রচারপত্রটি ৩ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে ঢাকা মহানগরীতে জনগণের কাছে বিলি করা হয়।

১২৩. তৎকালীন সংসদ অধিবেশনের কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য, ঢাকাঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪-০১-১৯৯২।

১২৪. নুরুল ইসলাম (বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি) এর ভাষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠান, ১৬ মার্চ ১৯৮২।

১২৫. নাজিমুদ্দিন মোস্তান, “প্রভুর সংগে বিদায়" বাংলাদেশের স্পয়েল সিস্টেমের প্রবর্তক এরশাদ, ঢাকাঃ সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা-২১।

১২৬. পিটার নেসওয়ান্ডের সঙ্গে জেনারেল এরশাদেরসাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য: দি হোলি ডে ১৮ অক্টোবর ১৯৮১।

১২৭. সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তালিকা, ১৯৯০।

১২৮, সংবাদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক অজানা কাহিনী,০৩-০১-১৯৯১।

১২৯. সমর্থিত সূত্রে প্রাপ্ত এরশাদের পদত্যাগের পরে ৬ই ডিসেম্বর টেলিভিশনের প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারেলেঃ জেনারেল নুরউদ্দিন বলেন বর্তমান বিশ্বের সর্ব এই গণতন্ত্রের জোয়ার এসেছে।

সাক্ষাৎকারগ্রহণঃ

১৩০. সাক্ষাৎকার গ্রহণ: বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

১৩১. সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মোহাম্মদ হানিফ ৬ অক্টোবর ১৯৯৪।

১৩২. সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী (জাতীয় সংসদের উপনেতা) ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

১৩৩. সমর্থিত সূত্রে প্রাপ্ত এরশাদের পদত্যাগের পরে ৬ই ডিসেম্বর টেলিভিশনের প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকার কালে জেনারেল নুরউদ্দিন বলেন বর্তমান বিশ্বের সর্ব এই গণতন্ত্রের জোয়ার এসেছে।

ইংরেজীঃ

১৩৪. Government of Bangladesh, Tables of organization and E 2 ripmrat: Ministries, Constitutional Bodies, Commissions etc. Dhaka-1982.

১৩৫. Martial Law Proclamation Order Registered No D A I. The Bangladesh Gazette Extraordinary Published by Authorty, Wednesday, March ২৪, ১৯৮২।

১৩৬. Sen, ‘Bangla Army Chief Issues on pole in Government' The Hindustan Times, 22 November 1981.

১৩৭. TalukderMoniruzzaman, Polities and Security of Bangladesh, Dhaka: University Prass Ltd., 1994, P. 143

১৩৮. The International Herald Tribune, 27 August 1981.

১৩৯. The Guardian (London), 7 October 1981.